EHSANUL HOQUE SAJID

কুরআনের আলোকে

কুরআনে বর্ণিত নবীদের জীবন

আদম (আ.) থেকে মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত
৩০ পর্বে ধারাবাহিক জীবনী

সংকলন ও সম্পাদনা

ইহছানুল হক ছাজিদ

কুরআনের আলোকে

কুরআনে বর্ণিত নবীদের জীবন

আদম (আ.) থেকে মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত

৩০ পর্বে ধারাবাহিক জীবনী

সংকলন ও সম্পাদনা

ইহছানুল হক ছাজিদ

এআই সহায়তায় প্রস্তুত; সম্পাদনা ও যাচাই: ইহছানুল হক ছাজিদ

সূচিপত্র

প্রথম অংশ — আদি যুগের নবীগণ পর্ব ১–৩

১ আদম (আ.) ৬
২ ইদরিস (আ.) ৯
৩ নূহ (আ.) ১১

দ্বিতীয় অংশ — 'আদ, সামূদ ও ইবরাহিমী ধারা পর্ব ৪–৯

৪ হূদ (আ.)-এর দাওয়াত ও 'আদ জাতির ধ্বংস ১৯
৫ সালিহ (আ.)-এর দাওয়াত ও সামূদ জাতির অবাধ্যতার পরিণতি ২৩
৬ ইবরাহিম (আ.) ও তাওহীদের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম ২৬
৭ ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) ৩০
৮ লূত (আ.) ৩৪
৯ ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.) ৩৮

তৃতীয় অংশ — ধৈর্য ও ন্যায়ের নবীগণ পর্ব ১০–১২

১০ ইউসুফ (আ.) ৪২
১১ আইয়ূব (আ.) ৪৬
১২ শু'আইব (আ.) ও মাদইয়ানবাসীর প্রতারণা, অন্যায় ও ন্যায়ের আহ্বান ৪৯

চতুর্থ অংশ — মূসা ও হারূন (আ.) পর্ব ১৩–২০

১৩ মূসা (আ.) ৫৪
১৪ মূসা (আ.) ৫৮
১৫ মূসা (আ.) ও ফিরআউন ৬৩
১৬ মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈলের মুক্তি ৬৭
১৭ মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈল ৭১
১৮ মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈল ৭৫

১৯ মূসা (আ.) ও খিজির ৭৯
২০ হারূন (আ.) ৮৪

পঞ্চম অংশ — বনি ইসরাঈলের পরবর্তী নবীগণ পর্ব ২১–২৯

২১ যুলকিফল (আ.) ৮৯
২২ দাউদ (আ.) ৯১
২৩ সুলাইমান (আ.) ৯৫
২৪ ইলিয়াস (আ.) ১০০
২৫ আল-ইয়াসা (আ.) ১০৩
২৬ ইউনুস (আ.) ১০৫
২৭ যাকারিয়া (আ.) ১০৯
২৮ ইয়াহইয়া (আ.) ১১২
২৯ ঈসা (আ.) ১১৫

সমাপনী অংশ — সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم পর্ব ৩০–৩০

৩০ মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم ১২০

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ

পর্ব অনুযায়ী সূত্রের তালিকা ১২৪

প্রথম অংশ

আদি যুগের নবীগণ

আদম, ইদরিস ও নূহ (আ.)

পর্ব ১ – ৩

প র্ব

১

আদম (আ.)

মানবজাতির সূচনা

পৃথিবী তখনও মানুষের পদচারণায় মুখর নয়। পাহাড় আছে, সাগর আছে, আকাশ আছে, ফেরেশতারা আছে—কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস তখনও শুরু হয়নি। সেই সময় আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন,

> "আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩০

ফেরেশতারা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা তো আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।" আল্লাহ উত্তরে বললেন,

> "নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩০

এরপর আল্লাহ মাটি থেকে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁকে সুন্দর আকৃতিতে গঠন করে তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন। (সূরা সাদ, ৩৮:৭১–৭২)

আদম (আ.)-এর মর্যাদা শুধু তাঁর সৃষ্টি নয়; আল্লাহ তাঁকে এমন জ্ঞান দান করলেন, যা ফেরেশতাদের দেওয়া হয়নি। তিনি আদম (আ.)-কে বিভিন্ন বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। পরে সেই জ্ঞানের পরিচয় ফেরেশতাদের সামনে তুলে ধরলে তারা বিনয়ের সঙ্গে বললেন,

> "আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩১–৩২

এই ঘটনার পর আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন আদম (আ.)-কে সম্মান জানিয়ে সিজদা করতে। সবাই আল্লাহর আদেশ মেনে নিল, কিন্তু ইবলিস অহংকারে অন্ধ হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল। সে বলল,

> "আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১২

একটি অহংকারী বাক্যই তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ তাকে নিজের রহমত থেকে বিতাড়িত করলেন। (সূরা আল-হিজর, ১৫:৩৪–৩৫)

এরপর আল্লাহ আদম (আ.)-এর জন্য তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন এবং উভয়কে জান্নাতে বসবাসের অনুমতি দিলেন। সেখানে সবকিছুই তাদের জন্য বৈধ ছিল, শুধু একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। (সূরা আল-বাকারা, ২:৩৫)

ইবলিস তার শত্রুতা ভুলে যায়নি। সে প্রতারণা ও কুমন্ত্রণার মাধ্যমে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে প্রলুব্ধ করল। অবশেষে তারা ভুল করলেন। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২০–২২)

কিন্তু এখানেই আদম (আ.)-এর মহত্ত্ব প্রকাশ পেল। তিনি নিজের ভুলকে অহংকার দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করলেন না, বরং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেন। গভীর অনুতাপে বললেন,

> "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৩

আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন। (সূরা আল-বাকারা, ২:৩৭) তবে মানবজাতির পরীক্ষার সূচনা হলো পৃথিবীতে। আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে পৃথিবীতে অবতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিলেন,

> "যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে, যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩৮

সেদিন থেকেই পৃথিবীতে মানুষের যাত্রা শুরু। এই পৃথিবী চিরস্থায়ী আবাস নয়; এটি পরীক্ষা। এখানে কখনো মানুষ ভুল করবে, কখনো শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করবে, আবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসার দরজাও সবসময় খোলা থাকবে।

আদম (আ.)-এর জীবনের শুরুতেই দুটি পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। একদিকে ইবলিসের অহংকার —যা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে আদম (আ.)-এর তাওবা—যা তাঁকে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের অধিকারী করে।

আজও মানুষ এই দুই পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভুল হয়ে গেলে আমরা কি ইবলিসের মতো অহংকারে অটল থাকব, নাকি আদম (আ.)-এর মতো বিনম্র হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসব?

আদম (আ.)-এর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষকে নিষ্পাপ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং ভুলের পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার ভুল নয়, বরং তার তাওবা। আর আল্লাহর হিদায়াতই সেই আলো, যা অনুসরণ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করা যায়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ, আমরা জানব ইদরিস (আ.)-এর জীবন থেকে কুরআনের আলোয় শিক্ষা।

প র্ব

২

ইদরিস (আ.)

সত্য, জ্ঞান ও উচ্চ মর্যাদার এক নবী

আদম (আ.)-এর পর পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে ঈমান যেমন ছিল, তেমনি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল গাফিলতি, অন্যায় এবং সত্য থেকে বিচ্যুতি। এমন এক সময় আল্লাহ এমন এক নবীকে মনোনীত করলেন, যাঁর পরিচয় কুরআনে এসেছে সত্যবাদিতা, নবুওয়াত এবং উচ্চ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে। তিনি হলেন ইদরিস (আ.)।

কুরআনে তাঁর আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেই অল্প কয়েকটি আয়াতেই তাঁর মহত্ত্বের এক অনন্য পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "এই কিতাবে ইদরিসের কথাও স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী, একজন নবী। আর আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৫৬–৫৭

কুরআন ইদরিস (আ.)-এর জীবনের দীর্ঘ বর্ণনা দেয়নি। তিনি কোন জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, কত বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন কিংবা তাঁর জীবনের বিস্তারিত ঘটনাগুলো কুরআনে উল্লেখ নেই। তাই এ বিষয়ে ভিত্তিহীন কাহিনি বা দুর্বল বর্ণনার ওপর নির্ভর না করে, কুরআন যতটুকু বলেছে ততটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

তাঁর পরিচয়ের প্রথম শব্দই আমাদের ভাবিয়ে তোলে—"সিদ্দীক", অর্থাৎ অত্যন্ত সত্যবাদী। সত্য তাঁর চরিত্রের অলংকার ছিল। কথায়, কাজে, দাওয়াতে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে তিনি ছিলেন অবিচল। সত্যের ওপর অটল থাকা একজন মানুষকেই আল্লাহ নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

এরপর আল্লাহ তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন। মানুষের কাছে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, আল্লাহর আনুগত্যের আহ্বান জানানো এবং সত্যের পথে মানুষকে পরিচালিত করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব।

সবশেষে আল্লাহ বলেন,

> "আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৫৭

এই "উচ্চ মর্যাদা" সম্পর্কে কুরআন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়নি। তবে সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم মিরাজের রাতে আসমানসমূহ ভ্রমণের সময় চতুর্থ আসমানে ইদরিস (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৪)

এর বেশি কিছু নিশ্চিতভাবে বলা আমাদের জন্য সমীচীন নয়। কারণ যে বিষয়ে কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ নীরব, সেখানে অনুমান বা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া একজন মুমিনের পথ হতে পারে না।

ইদরিস (আ.)-এর জীবন আমাদের একটি গভীর শিক্ষা দেয়। কখনো কখনো আল্লাহ কোনো বান্দার জীবনের অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করেন না; বরং তাঁর একটি গুণকেই ইতিহাসের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। ইদরিস (আ.)-এর ক্ষেত্রে সেটি ছিল তাঁর সত্যবাদিতা। মনে হয় যেন আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন—একজন মানুষের প্রকৃত মর্যাদা তার সম্পদ, বংশ বা ক্ষমতায় নয়; বরং তার ঈমান, সত্যবাদিতা এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতায়।

আজ এমন এক সময়ে আমরা বাস করছি, যখন মিথ্যা অনেক সময় সহজ পথ মনে হয়। কিন্তু ইদরিস (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যের পথই শেষ পর্যন্ত মানুষের মর্যাদা বাড়ায়। মানুষ হয়তো সবসময় তা দেখতে পায় না, কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই দেখেন।

তাঁর জীবনের আরেকটি শিক্ষা হলো, কুরআন যতটুকু জানিয়েছে, ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকা। দ্বীনের জ্ঞান কৌতূহল মেটানোর জন্য নয়; বরং আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন গড়ার জন্য।

ইদরিস (আ.)-এর নাম কুরআনে মাত্র কয়েকবার এসেছে, কিন্তু সেই অল্প কয়েকটি আয়াত আজও আমাদের শেখায়—সত্যবাদিতা একজন মানুষকে এমন উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিতে পারে, যা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
নূহ (আ.)—নয়শ পঞ্চাশ বছরের দাওয়াত, অবিচল ধৈর্য এবং মহাপ্লাবনের ইতিহাস।

প র্ব

৩

নূহ (আ.)

নয়শ পঞ্চাশ বছরের দাওয়াত

মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল, কিন্তু বাড়ছিল না আল্লাহর আনুগত্য। সময়ের প্রবাহে শয়তান মানুষের অন্তরে এমনভাবে কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে দিল যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে সৎ মানুষের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে মূর্তি বানাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সেই মূর্তিগুলোই উপাস্যের রূপ নিল। পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে শিরকের বিস্তার ঘটল। (সূরা নূহ, ৭১:২৩; সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯২০)

এই অন্ধকার সময়েই আল্লাহ নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতির কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন।

আল্লাহ বললেন,

> "আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।'"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৯

নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবেসে ডাকতেন। বারবার বলতেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর দিকে ফিরে এসো। কারণ তিনি ক্ষমাশীল।

তিনি বলেছিলেন,

> "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-

> সন্ততি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের জন্য উদ্যান ও নদী দান করবেন।"
>
> — সূরা নূহ, ৭১:১০–১২

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী তিনি একই আহ্বান জানিয়ে গেলেন। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে, কখনো রাতে, কখনো দিনে। (সূরা নূহ, ৭১:৫–৯)

কিন্তু তাঁর জাতির অধিকাংশ মানুষ সত্য গ্রহণ করল না। তারা কান বন্ধ করে নিল, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিল এবং অহংকারে অটল রইল। (সূরা নূহ, ৭১:৭)

কুরআন জানায়,

> "তিনি তাদের মধ্যে নয়শ পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন।"
>
> — সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:১৪

ভাবা যায়? একটি দিন, একটি মাস বা একটি বছর নয়—নয়শ পঞ্চাশ বছর ধরে একই দাওয়াত, একই ধৈর্য, একই আশা। অথচ ঈমান আনল খুব অল্পসংখ্যক মানুষ। (সূরা হূদ, ১১:৪০)

যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অবিশ্বাসীরা আর ঈমান আনবে না, তখন আল্লাহ নূহ (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন,

> "তোমার জাতির মধ্যে যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৩৬

এরপর আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। (সূরা হূদ, ১১:৩৭)

স্থলভাগে নৌকা বানাতে দেখে লোকেরা তাঁকে উপহাস করতে লাগল। তারা হাসত, বিদ্রূপ করত। নূহ (আ.) শান্তভাবে বলতেন,

> "আজ যদি তোমরা আমাদের নিয়ে হাসো, একদিন আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসব, যেমন তোমরা হাসছ।"

> — সূরা হূদ, ১১:৩৮

অবশেষে আল্লাহর প্রতিশ্রুত সময় এসে গেল। আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টি নামল, পৃথিবীর বুক থেকেও পানি উথলে উঠল। (সূরা আল-কামার, ৫৪:১১–১২)

আল্লাহর নির্দেশে নূহ (আ.) প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে এবং ঈমানদারদের নৌকায় তুলে নিলেন। (সূরা হূদ, ১১:৪০)

নৌকা যখন উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে চলেছে, তখন নূহ (আ.) তাঁর এক অবিশ্বাসী ছেলেকে ডাকলেন,

> "হে আমার সন্তান! আমাদের সঙ্গে ওঠো, কাফিরদের সঙ্গে থেকো না।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৪২

কিন্তু সে বলল,

> "আমি এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৪৩

নূহ (আ.) বললেন,

> "আজ আল্লাহর আদেশ থেকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই, তিনি যাকে দয়া করবেন সে ছাড়া।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৪৩

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বিশাল ঢেউ বাবা ও ছেলের মাঝখানে আড়াল হয়ে গেল। ছেলেটি ডুবে গেল। (সূরা হূদ, ১১:৪৩)

মহাপ্লাবনের পর আল্লাহ পৃথিবীকে নির্দেশ দিলেন,

> "হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শুষে নাও। আর হে আকাশ! থেমে যাও।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৪৪

পানি নেমে গেল। নৌকা স্থির হলো জুদি পর্বতের ওপর। (সূরা হূদ, ১১:৪৪)

নূহ (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, সফলতা সবসময় মানুষের সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না; বরং আল্লাহর কাছে দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে মাপা যায়। তিনি শত শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু অল্পসংখ্যক মানুষ ঈমান এনেছে। তবুও আল্লাহ তাঁকে সফল নবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এই ঘটনাও শেখায় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঈমানের বিকল্প নয়। একজন নবীর সন্তানও যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তবে সেই সম্পর্ক তাকে রক্ষা করতে পারে না। প্রকৃত মর্যাদা কেবল ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যে।

নূহ (আ.)-এর ধৈর্য আজও প্রত্যেক দাঈ, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সত্যের পথে চলা মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানুষের প্রতিক্রিয়া আমাদের হাতে নয়; আমাদের দায়িত্ব হলো সত্যকে সুন্দরভাবে পৌঁছে দেওয়া। ফলাফল আল্লাহর হাতে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
হূদ (আ.)—শক্তিশালী 'আদ জাতির অহংকার এবং আল্লাহর সতর্কবার্তা।📖 কুরআনে বর্ণিত নবীদের জীবন | পর্ব–৩

নূহ (আ.): নয়শ পঞ্চাশ বছরের দাওয়াত

মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল, কিন্তু বাড়ছিল না আল্লাহর আনুগত্য। সময়ের প্রবাহে শয়তান মানুষের অন্তরে এমনভাবে কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে দিল যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে সৎ মানুষের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে মূর্তি বানাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সেই মূর্তিগুলোই উপাস্যের রূপ নিল। পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে শিরকের বিস্তার ঘটল। (সূরা নূহ, ৭১:২৩; সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯২০)

এই অন্ধকার সময়েই আল্লাহ নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতির কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন।

আল্লাহ বললেন,

> "আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।'"

— সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৯

নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবেসে ডাকতেন। বারবার বলতেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর দিকে ফিরে এসো। কারণ তিনি ক্ষমাশীল।

তিনি বলেছিলেন,

> "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের জন্য উদ্যান ও নদী দান করবেন।"
>
> — সূরা নূহ, ৭১:১০–১২

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী তিনি একই আহ্বান জানিয়ে গেলেন। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে, কখনো রাতে, কখনো দিনে। (সূরা নূহ, ৭১:৫–৯)

কিন্তু তাঁর জাতির অধিকাংশ মানুষ সত্য গ্রহণ করল না। তারা কান বন্ধ করে নিল, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিল এবং অহংকারে অটল রইল। (সূরা নূহ, ৭১:৭)

কুরআন জানায়,

> "তিনি তাদের মধ্যে নয়শ পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন।"
>
> — সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:১৪

ভাবা যায়? একটি দিন, একটি মাস বা একটি বছর নয়—নয়শ পঞ্চাশ বছর ধরে একই দাওয়াত, একই ধৈর্য, একই আশা। অথচ ঈমান আনল খুব অল্পসংখ্যক মানুষ। (সূরা হূদ, ১১:৪০)

যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অবিশ্বাসীরা আর ঈমান আনবে না, তখন আল্লাহ নূহ (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন,

> "তোমার জাতির মধ্যে যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না।"

> — সূরা হূদ, ১১:৩৬

এরপর আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। (সূরা হূদ, ১১:৩৭)

স্থলভাগে নৌকা বানাতে দেখে লোকেরা তাঁকে উপহাস করতে লাগল। তারা হাসত, বিদ্রূপ করত। নূহ (আ.) শান্তভাবে বলতেন,

> "আজ যদি তোমরা আমাদের নিয়ে হাসো, একদিন আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসব, যেমন তোমরা হাসছ।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৩৮

অবশেষে আল্লাহর প্রতিশ্রুত সময় এসে গেল। আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টি নামল, পৃথিবীর বুক থেকেও পানি উথলে উঠল। (সূরা আল-কামার, ৫৪:১১–১২)

আল্লাহর নির্দেশে নূহ (আ.) প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে এবং ঈমানদারদের নৌকায় তুলে নিলেন। (সূরা হূদ, ১১:৪০)

নৌকা যখন উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে চলেছে, তখন নূহ (আ.) তাঁর এক অবিশ্বাসী ছেলেকে ডাকলেন,

> "হে আমার সন্তান! আমাদের সঙ্গে ওঠো, কাফিরদের সঙ্গে থেকো না।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৪২

কিন্তু সে বলল,

> "আমি এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৪৩

নূহ (আ.) বললেন,

> "আজ আল্লাহর আদেশ থেকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই, তিনি যাকে দয়া করবেন সে ছাড়া।"

> — সূরা হূদ, ১১:৪৩

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বিশাল ঢেউ বাবা ও ছেলের মাঝখানে আড়াল হয়ে গেল। ছেলেটি ডুবে গেল। (সূরা হূদ, ১১:৪৩)

মহাপ্লাবনের পর আল্লাহ পৃথিবীকে নির্দেশ দিলেন,

> "হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শুষে নাও। আর হে আকাশ! থেমে যাও।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৪৪

পানি নেমে গেল। নৌকা স্থির হলো জুদি পর্বতের ওপর। (সূরা হূদ, ১১:৪৪)

নূহ (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, সফলতা সবসময় মানুষের সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না; বরং আল্লাহর কাছে দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে মাপা যায়। তিনি শত শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু অল্পসংখ্যক মানুষ ঈমান এনেছে। তবুও আল্লাহ তাঁকে সফল নবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এই ঘটনাও শেখায় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঈমানের বিকল্প নয়। একজন নবীর সন্তানও যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তবে সেই সম্পর্ক তাকে রক্ষা করতে পারে না। প্রকৃত মর্যাদা কেবল ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যে।

নূহ (আ.)-এর ধৈর্য আজও প্রত্যেক দাঈ, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সত্যের পথে চলা মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানুষের প্রতিক্রিয়া আমাদের হাতে নয়; আমাদের দায়িত্ব হলো সত্যকে সুন্দরভাবে পৌঁছে দেওয়া। ফলাফল আল্লাহর হাতে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
হূদ (আ.)—শক্তিশালী 'আদ জাতির অহংকার এবং আল্লাহর সতর্কবার্তা।

দ্বিতীয় অংশ

'আদ, সামূদ ও ইবরাহিমী ধারা

হূদ, সালিহ, ইবরাহিম, ইসমাঈল, লূত, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.)

পর্ব ৪ – ৯

প র্ব

৪

হূদ (আ.)-এর দাওয়াত ও 'আদ জাতির ধ্বংস

মহাপ্লাবনের পর পৃথিবী আবার ধীরে ধীরে জনবসতিতে ভরে উঠল। মানুষের জীবন স্বাভাবিক হলো, নতুন নতুন জাতির উদ্ভব ঘটল। তাদের মধ্যেই ছিল এক শক্তিশালী জাতি—'আদ। তারা বসবাস করত উঁচু স্তম্ভবিশিষ্ট নগরী ইরামে। শক্তি, সম্পদ, সুউচ্চ স্থাপনা—সবকিছুতেই তারা ছিল অনন্য। (সূরা আল-ফাজর, ৮৯:৬–৮)

তাদের দেহ ছিল বলিষ্ঠ, সভ্যতা ছিল উন্নত, আর সেই শক্তির কারণেই তাদের অন্তরে জন্ম নিল অহংকার। তারা মনে করতে শুরু করল, পৃথিবীতে তাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই।

তাদের বিপথগামিতা দেখে মহান আল্লাহ তাঁদের কাছে তাঁর সম্মানিত নবী হযরত হূদ (আ.)-কে প্রেরণ করলেন, যেন তিনি তাদের এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানান।

তিনি ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন,

> "হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমরা কি তবুও তাকওয়া অবলম্বন করবে না?"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৬৫

হূদ (আ.) তাদের কাছে কোনো সম্পদ বা প্রতিদান চাননি। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন,

> "হে আমার জাতি! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তার কাছেই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৫১

কিন্তু অহংকার মানুষের বিবেককে অন্ধ করে দেয়। 'আদ জাতির নেতারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল। তারা বলল,

> "আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৬৬

হূদ (আ.) শান্তভাবে উত্তর দিলেন,

> "হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই। বরং আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৬৭

তিনি তাদের আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, আল্লাহই তাদের শক্তি দিয়েছেন, সমৃদ্ধি দিয়েছেন। তাই শক্তির অহংকার নয়, বরং কৃতজ্ঞতাই হওয়া উচিত তাদের পরিচয়। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৬৯)

কিন্তু তারা বলল,

> "আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?"
>
> — সূরা ফুসসিলাত, ৪১:১৫

কুরআন সঙ্গে সঙ্গে এই অহংকারের জবাব দেয়,

> "তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী?"
>
> — সূরা ফুসসিলাত, ৪১:১৫

হূদ (আ.) বহুবার সতর্ক করলেন। কিন্তু তারা সতর্কবার্তাকে উপহাসে পরিণত করল। অবশেষে আল্লাহর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলো।

প্রথমে আকাশে একটি কালো মেঘ দেখা দিল। 'আদ জাতির মানুষ আনন্দে বলল,

> "এটি তো মেঘ, আমাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে এসেছে।"
>
> — সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:২৪

কিন্তু সেটি রহমতের মেঘ ছিল না। আল্লাহ বললেন,

> "বরং এটি সেই শাস্তি, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে—একটি ঝড়ো হাওয়া, যার মধ্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"
>
> — সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:২৪

সাত রাত এবং আট দিন ধরে সেই প্রচণ্ড ঝড় অবিরাম বয়ে চলল। (সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:৭)

এত প্রবল ছিল সেই বাতাস যে, শক্তিশালী মানুষগুলোকে মাটি থেকে তুলে আছড়ে ফেলছিল। কুরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলে,

> "তখন তুমি সেই জাতিকে এমনভাবে পড়ে থাকতে দেখতে, যেন তারা উপড়ে পড়া খেজুরগাছের কাণ্ড।"
>
> — সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:৭

একসময় সেই শক্তিশালী সভ্যতার আর কোনো চিহ্ন রইল না।

আল্লাহ বলেন,

> "আর আমি হূদ ও তাঁর সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীদের আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করেছিলাম।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৫৮

'আদ জাতির কাহিনি আজও মানুষের জন্য একটি আয়না। শক্তি, সম্পদ, উন্নত প্রযুক্তি কিংবা বিশাল স্থাপনা—এসব আল্লাহর নেয়ামত। কিন্তু যখন মানুষ এগুলোকে নিজের কৃতিত্ব মনে করে স্রষ্টাকে ভুলে যায়, তখন সেই শক্তিই তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হূদ (আ.)-এর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যের দাওয়াত দেওয়া কখনো সহজ ছিল না। নবীরাও উপহাসের শিকার হয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন। তবুও তারা মানুষের কল্যাণ কামনা করা বন্ধ করেননি।

আজও পৃথিবীর অনেক মানুষ নিজেদের ক্ষমতা, সম্পদ কিংবা জ্ঞানের কারণে অহংকার করে। কিন্তু 'আদ জাতির ধ্বংসাবশেষ নীরবে সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহর চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
সালিহ (আ.)—সামূদ জাতি, পাহাড় কেটে নির্মিত নগরী এবং আল্লাহর অলৌকিক উটনীর ঘটনা।

প র্ব

৫

সালিহ (আ.)-এর দাওয়াত ও সামূদ জাতির অবাধ্যতার পরিণতি

'আদ জাতির ধ্বংসের পর পৃথিবীর বুকে আরেকটি শক্তিশালী জাতির উত্থান ঘটল। তারা ছিল সামূদ। আল্লাহ তাদের সমৃদ্ধি, শক্তি ও শিল্পকলার অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। তারা পাহাড় কেটে সুদৃঢ় প্রাসাদ ও ঘর নির্মাণ করত। মরুভূমির বুকে তাদের স্থাপত্য ছিল বিস্ময়কর। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৭৪ ; সূরা আল-ফাজর, ৮৯:৯)

কিন্তু আগের বহু জাতির মতো তারাও ধীরে ধীরে আল্লাহকে ভুলে গেল। তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হলো এবং নিজেদের শক্তি ও সভ্যতাকেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মনে করতে লাগল।

তখন মহান আল্লাহ তাদের হিদায়াতের জন্য তাঁদেরই মধ্য থেকে তাঁর সম্মানিত নবী সালিহ (আ.)-কে প্রেরণ করলেন।

তিনি ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন,

> "হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তোমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁরই দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি নিকটবর্তী, দোয়া কবুলকারী।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৬১

কিন্তু জাতির প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল,

> "হে সালিহ! এর আগে তো তুমি আমাদের কাছে অনেক আশা-ভরসার মানুষ ছিলে। এখন কি তুমি আমাদেরকে সেই উপাস্যদের ইবাদত করতে নিষেধ করছ, যাদের ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষরা করত?"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৬২

সালিহ (আ.) ধৈর্য ধরে তাদের বোঝাতে থাকলেন। কিন্তু তারা ঈমান আনার পরিবর্তে একটি অলৌকিক নিদর্শন দাবি করল। তারা এমন একটি নিদর্শন চাইল, যা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

আল্লাহ তাদের দাবির জবাবে এক বিস্ময়কর মুজিযা দান করলেন। একটি বিশাল পাথর থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় একটি উটনী বের হয়ে এলো। এটি ছিল মানুষের তৈরি কোনো জাদু নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

সালিহ (আ.) বললেন,

> "হে আমার জাতি! এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও এবং কোনো কষ্ট দিও না। তা না হলে অচিরেই তোমাদের ওপর কঠিন শাস্তি নেমে আসবে।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৭৩

উটনীর জন্য পানিরও নির্ধারিত পালা ছিল। একদিন সে পানি পান করত, আর অন্যদিন মানুষ। আল্লাহ বলেন,

> "পানির অংশ তাদের মধ্যে ভাগ করা থাকবে; প্রত্যেকে নিজ নিজ পালায় পানি গ্রহণ করবে।"
>
> — সূরা আল-কামার, ৫৪:২৮

কিন্তু অহংকার মানুষের হৃদয়কে কঠিন করে দেয়। জাতির অবাধ্য নেতারা ষড়যন্ত্র করল। তারা সেই নিরপরাধ উটনীটিকে হত্যা করল। (সূরা আশ-শামস, ৯১:১৪)

এরপর সালিহ (আ.) তাদের শেষবারের মতো সতর্ক করে বললেন,

> "তোমরা নিজেদের ঘরে তিন দিন ভোগ করে নাও। এরপর এমন শাস্তি আসবে, যা মিথ্যা হবে না।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৬৫

তিন দিন পর আল্লাহর প্রতিশ্রুত সময় এসে গেল। এক প্রচণ্ড বিকট শব্দ এবং ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করল। (সূরা হূদ, ১১:৬৭; সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৭৮)

সকালের আলো ফুটতেই যে জনপদে প্রাণচাঞ্চল্য ছিল, সেখানে নেমে এলো ভয়াবহ নীরবতা। কুরআন বলে,

> "তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৬৭

মহান আল্লাহ সালিহ (আ.) এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিলেন, তাঁদের নিজ রহমতে রক্ষা করলেন। (সূরা হূদ, ১১:৬৬)

সামূদ জাতির কাহিনি শুধু একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার ইতিহাস নয়; এটি মানুষের অবাধ্যতার ইতিহাস। আল্লাহ তাদের শক্তি দিয়েছিলেন, সম্পদ দিয়েছিলেন, শিল্পকলা দিয়েছিলেন এবং সত্যের পথ দেখানোর জন্য একজন নবীও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান করার পরিবর্তে ঔদ্ধত্যের পথ বেছে নিয়েছিল।

আজও মানুষ যখন আল্লাহর নিদর্শনকে অবহেলা করে, সত্যকে অস্বীকার করে এবং নিজের ক্ষমতাকে সবকিছু মনে করে, তখন সামূদ জাতির পরিণতি একটি নীরব সতর্কবার্তা হয়ে সামনে দাঁড়ায়। আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো তাঁর আনুগত্য করা, অহংকার নয়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ইবরাহিম (আ.) ও তাওহীদের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম।

প র্ব

৬

ইবরাহিম (আ.) ও তাওহীদের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম

সময়ের স্রোতে মানুষ আবারও আল্লাহকে ভুলে যেতে শুরু করল। তারা আকাশের তারা, চাঁদ, সূর্য এবং নিজের হাতে গড়া মূর্তির সামনে মাথা নত করত। এমনকি একজন দক্ষ ভাস্কর নিজের হাতে মূর্তি বানিয়ে, পরে সেই মূর্তিকেই উপাস্য হিসেবে মানুষের কাছে তুলে ধরতেন। সেই ভাস্করদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আজার—তিনি ছিলেন ইবরাহিম (আ.)-এর পিতা। (সূরা আল-আন'আম, ৬:৭৪)

এমন এক সমাজেই মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানিত নবী ইবরাহিম (আ.)-কে মনোনীত করলেন। শৈশব থেকেই আল্লাহ তাঁকে সত্যের সন্ধানী হৃদয় দান করেছিলেন। চারপাশের মানুষ যা অন্ধভাবে বিশ্বাস করত, তিনি তা নিয়ে ভাবতেন, প্রশ্ন করতেন।

একদিন তিনি তাঁর পিতাকে স্নেহভরে বললেন,

> "হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন কিছুর ইবাদত করেন, যা শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো উপকারও করতে পারে না?"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৪২

তিনি আরও বললেন,

> "হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। তাই আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৪৩

কিন্তু তাঁর পিতা সত্য গ্রহণ করলেন না। বরং রাগান্বিত হয়ে বললেন,

> "হে ইবরাহিম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। এখন তুমি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৪৬

ইবরাহিম (আ.) প্রতিশোধের ভাষায় উত্তর দিলেন না। তিনি শান্তভাবে বললেন,

> "আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৪৭

এরপর তিনি তাঁর জাতির দিকেও একই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন,

> "এই মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর সামনে তোমরা একাগ্র হয়ে বসে থাক?"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৫২

তারা বলল,

> "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এগুলোর ইবাদত করতে দেখেছি।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৫৩

শুধু পূর্বপুরুষদের অনুসরণই তাদের যুক্তি ছিল।

একদিন জাতির সবাই উৎসবে চলে গেলে ইবরাহিম (আ.) মন্দিরে প্রবেশ করলেন। বড় মূর্তিটি ছাড়া বাকি সব মূর্তি ভেঙে ফেললেন যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৫৭–৫৮)

মানুষ ফিরে এসে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের উপাস্যদের সঙ্গে এমন কাজ কে করেছে?"

ইবরাহিম (আ.) বললেন,

> "হয়তো এই বড় মূর্তিটিই করেছে। যদি তারা কথা বলতে পারে, তবে তাদেরই জিজ্ঞাসা করো।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৬৩

এই কথা শুনে তারা কিছুক্ষণ নিজেদের ভুল উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু অহংকার তাদের আবারও সত্য থেকে ফিরিয়ে নিল। (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৬৪–৬৫)

অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল—ইবরাহিম (আ.)-কে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে।

বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করা হলো। আগুন এতটাই প্রজ্জ্বলিত ছিল যে, তাঁকে হাতে নিয়ে সেখানে ফেলা সম্ভব ছিল না; তাই একটি নিক্ষেপযন্ত্রে বসিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। এই ঘটনার বিস্তারিত পদ্ধতি কুরআনে নেই; নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু আগুনেরও একজন মালিক আছেন।

আল্লাহ আদেশ দিলেন,

> "হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৬৯

মুহূর্তেই জ্বলন্ত আগুন আল্লাহর আদেশে শান্ত হয়ে গেল। ইবরাহিম (আ.) সম্পূর্ণ নিরাপদে বেরিয়ে এলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৭০

এই ঘটনার পর ইবরাহিম (আ.) নিজ জন্মভূমি ছেড়ে আল্লাহর পথে হিজরত করলেন। তিনি বললেন,

> "আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশে হিজরত করছি। নিশ্চয়ই তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
>
> — সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:২৬

ইবরাহিম (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, সত্যের পথে চলতে হলে কখনো কখনো সবচেয়ে কাছের মানুষও বিরোধিতা করতে পারে। কিন্তু একজন মুমিন সত্যকে ছেড়ে দেয় না, আবার শিষ্টাচারও হারায় না। তিনি নিজের পিতার বিরুদ্ধেও অশ্রদ্ধার ভাষা ব্যবহার করেননি।

তাঁর জীবন আরও শেখায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোনো কাজ করলেই তা সত্য হয়ে যায় না। সত্যের মানদণ্ড একমাত্র আল্লাহর ওহি।

আর আগুনের ঘটনাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—যিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর আদেশ ছাড়া আগুনও কাউকে পোড়াতে পারে না। তাই একজন মুমিনের ভরসা মানুষের শক্তির ওপর নয়, আল্লাহর কুদরতের ওপর।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)—কাবা নির্মাণ এবং আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ পরীক্ষা।

পর্ব

৭

ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)

আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ পরীক্ষা

আগুন ইবরাহিম (আ.)-কে স্পর্শ করতে পারেনি। মানুষের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবনের পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। বরং সামনে অপেক্ষা করছিল এমন কিছু পরীক্ষা, যা তাঁকে ইতিহাসে "খলিলুল্লাহ"—আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু—হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

আল্লাহ বলেন,

> "যখন তাঁর প্রতিপালক ইবরাহিমকে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি তা পূর্ণ করলেন, তখন আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম (নেতা) বানাচ্ছি।'"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১২৪

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইবরাহিম (আ.)-এর কোনো সন্তান ছিল না। বার্ধক্যে পৌঁছে তিনি আল্লাহর কাছে নেক সন্তান প্রার্থনা করলেন।

> "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একজন সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০০

আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলেন—ইসমাঈল (আ.)। (সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০১)

কিন্তু এই সন্তান জন্মের পরই আরেকটি কঠিন পরীক্ষা এল।

আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম (আ.) তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আ.) এবং শিশু ইসমাঈল (আ.)-কে এমন এক নির্জন উপত্যকায় রেখে এলেন, যেখানে না ছিল জনবসতি, না ছিল পানি, না ছিল ফসল।

ইবরাহিম (আ.) ফিরে যেতে শুরু করলে হাজেরা (আ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?"

তিনি শুধু বললেন, "হ্যাঁ।"

তখন হাজেরা (আ.) বললেন,

> "তাহলে আল্লাহ আমাদের কখনো বিনষ্ট করবেন না।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৩৬৪

এটি ছিল আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

ইবরাহিম (আ.) সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় কাবার স্থানের দিকে মুখ করে দোয়া করলেন,

> "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে এক অনাবাদী উপত্যকায় বসবাস করিয়েছি, যাতে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদের ফলমূল দ্বারা রিযিক দিন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়।"
>
> — সূরা ইবরাহিম, ১৪:৩৭

শিশু ইসমাঈল (আ.)-এর তৃষ্ণা বাড়তে লাগল। পানির সন্ধানে হাজেরা (আ.) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাতবার দৌড়ালেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৩৬৪)

অবশেষে আল্লাহর রহমত নেমে এলো। জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় মাটির বুক থেকে ফেটে বের হলো যমযমের পানি। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৩৬৪)

আজও সেই যমযমের ধারা কোটি কোটি মানুষের জন্য আল্লাহর এক জীবন্ত নিদর্শন।

বছর কেটে গেল। ইসমাঈল (আ.) বড় হতে লাগলেন। ঠিক তখনই ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হলো।

তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানি করছেন। নবীদের স্বপ্ন ওহি।

ইবরাহিম (আ.) পুত্রকে বললেন,

> "হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন বলো, তোমার কী মত?"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০২

ইসমাঈল (আ.)-এর উত্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ।

> "হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০২

একজন পিতা আল্লাহর আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। একজন পুত্রও আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

কুরআন সেই মুহূর্তকে সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত গভীরভাবে বর্ণনা করেছে—

> "অতঃপর যখন তারা উভয়েই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং ইবরাহিম তাঁর পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিলেন..."
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০৩

ঠিক তখনই আল্লাহ ডাক দিলেন,

> "হে ইবরাহিম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই। এটি ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০৪–১০৬

আল্লাহ ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি মহান কুরবানির পশু দান করলেন। (সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০৭)

আজ মুসলিম উম্মাহ যে ঈদুল আজহায় কুরবানি করে, তা এই মহান ঘটনার স্মৃতিকে জীবন্ত রাখে।

এর কিছুদিন পর আল্লাহ ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-কে তাঁর পবিত্র ঘর কাবা-র ভিত্তি উঁচু করার নির্দেশ দিলেন।

কুরআন বলে,

> "যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল কাবা ঘরের ভিত্তি উঁচু করছিলেন, তখন তারা দোয়া করছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১২৭

তারা আরও দোয়া করেছিলেন,

> "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত বানান এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও আপনার অনুগত একটি জাতি সৃষ্টি করুন..."
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১২৮

আরও প্রার্থনা করেছিলেন,

> "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১২৯

শতাব্দী পরে এই দোয়ার পূর্ণতা আসে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর আগমনের মাধ্যমে।

ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা শুধু কথায় নয়; প্রয়োজনে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করার মানসিকতায় প্রকাশ পায়। আবার এই ঘটনাই প্রমাণ করে, আল্লাহ তাঁর বান্দার ত্যাগকে কখনো বিফল করেন না। তিনি পরীক্ষাও নেন, আবার উত্তীর্ণদের সম্মানও দান করেন।

আজ হজের সাঈ, যমযম, কাবা এবং কুরবানি—সবই আমাদের সেই মহান পরিবারের ঈমান, ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
লূত (আ.): সত্যের আহ্বান ও সীমালঙ্ঘনকারী এক জাতির করুণ পরিণতি।

প র্ব

৮

লূত (আ.)

সত্যের আহ্বান ও সীমালঙ্ঘনকারী এক জাতির করুণ পরিণতি

ইবরাহিম (আ.)-এর সময়েই আল্লাহ তাঁর আরেক সম্মানিত নবী লূত (আ.)-কে নবুওয়াত দান করেন। তিনি ছিলেন ইবরাহিম (আ.)-এর নিকটাত্মীয় এবং তাঁর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীদের একজন। পরে আল্লাহ তাঁকে একটি বিশেষ জাতির কাছে প্রেরণ করেন, যারা বসবাস করত সদূম ও তার আশপাশের জনপদে। (সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:২৬; সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮০)

সেই জাতি সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল—তারা প্রকাশ্যে এমন অশ্লীলতা ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়েছিল, যা এর আগে পৃথিবীর কোনো জাতি করেনি।

লূত (আ.) অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বললেন,

> "তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে বিশ্বের কোনো জাতি করেনি ?"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮০

তিনি আরও বললেন,

> "তোমরা তো নারীদের ছেড়ে কামনা চরিতার্থ করার জন্য পুরুষদের কাছে যাও। বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।"

> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮১

লূত (আ.) শুধু একটি পাপের বিরুদ্ধেই কথা বলেননি। কুরআন জানায়, তারা পথচারীদের কষ্ট দিত, সভায় প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ করত এবং পাপকে স্বাভাবিক বিষয় মনে করত। (সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:২৯)

তিনি বারবার তাদের সতর্ক করলেন, আল্লাহকে ভয় করতে বললেন এবং পবিত্র জীবনযাপনের আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তাঁকেই উপহাস করল।

তারা বলল,

> "লূতের পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা তো নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে!"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:৫৬

এমনকি তারা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলল,

> "যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এসো।"
>
> — সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:২৯

লূত (আ.) তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

> "হে আমার প্রতিপালক! এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাতির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।"
>
> — সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৩০

এর কিছুদিন পর আল্লাহ ফেরেশতাদের মানব আকৃতিতে ইবরাহিম (আ.)-এর কাছে পাঠালেন। তারা তাঁকে ইসহাক (আ.)-এর সুসংবাদ দিলেন এবং জানালেন যে, তারা লূত (আ.)-এর জাতির ওপর আল্লাহর শাস্তি কার্যকর করতে যাচ্ছেন। (সূরা হূদ, ১১:৬৯–৭৬)

এরপর সেই ফেরেশতারা লূত (আ.)-এর বাড়িতে এলেন। তাঁদেরকে সুদর্শন যুবক মনে করে সেই জাতির লোকেরা কু-উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ির দিকে ছুটে এলো। (সূরা হূদ, ১১:৭৭–৭৯)

লূত (আ.) অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে বললেন,

> "হে আমার জাতি! এরা আমার কন্যারা (অর্থাৎ তোমাদের জন্য বৈধ নারীরা)। এদেরই বিয়ে করো; এটাই তোমাদের জন্য পবিত্র। আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৭৮

কিন্তু তারা জবাব দিল,

> "তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদের প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। আর আমরা কী চাই, তাও তুমি ভালো করেই জানো।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৭৯

ঠিক তখনই ফেরেশতারা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করলেন। তারা বললেন,

> "হে লূত! আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনোই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। আপনি রাতের একাংশে আপনার পরিবারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আর তোমাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী ব্যতিক্রম; তাদের ওপর যা আসবে, তার ওপরও তা-ই আসবে।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৮১

লূত (আ.) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাতেই ঈমানদারদের নিয়ে জনপদ ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ঈমান আনেননি। তিনি অবাধ্যদের পক্ষেই থেকে গেলেন। কুরআন তাঁকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছে। (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:১০)

সকালে আল্লাহর শাস্তি নেমে এলো।

আল্লাহ বলেন,

> "অতঃপর যখন আমার নির্দেশ এলো, আমি সেই জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর স্তরে স্তরে পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।"

— সূরা হূদ, ১১:৮২

আরেক স্থানে আল্লাহ বলেন,

"আমি তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সতর্ক করা হয়েছিল অথচ যারা সতর্কবার্তা মানেনি, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ ছিল!"

— সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৪

একটি সমৃদ্ধ জনপদ মুহূর্তের মধ্যে ইতিহাসে পরিণত হলো।

আজও লূত (আ.)-এর সীমালঙ্ঘনকারী কওমের কাহিনি শুধু একটি জাতির ধ্বংসের বিবরণ নয়; এটি আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করার পরিণতির একটি কঠিন সতর্কবার্তা। সমাজ যখন পাপকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়, সত্যকে উপহাস করে এবং আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, তখন সেই সমাজ নিজের ধ্বংসের পথ নিজেই তৈরি করে।

লূত (আ.) আমাদের শেখান, সত্যের পথে অবিচল থাকা কখনো কখনো অত্যন্ত কঠিন হয়। এমনকি নিজের পরিবার থেকেও সবাই ঈমানের পথে থাকবে—এর নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর ওপরই ভরসা রাখা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)—নবুওয়াতের বরকতময় ধারাবাহিকতা।

পর্ব

৯

ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)

নবুওয়াতের বরকতময় ধারাবাহিকতা

লূত (আ.)-এর জাতির ওপর আল্লাহর শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগেই ফেরেশতারা ইবরাহিম (আ.)-এর কাছে এসেছিলেন। তাঁরা প্রথমে তাঁকে একটি সুসংবাদ দিয়েছিলেন—বার্ধক্যে তাঁর ঘরে আরেক পুত্রের জন্ম হবে।

কুরআন বর্ণনা করে, ফেরেশতারা সালাম দিয়ে ইবরাহিম (আ.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁদের জন্য ভাজা গো বাছুরের গোশত নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁরা খাবারে হাত বাড়ালেন না। ইবরাহিম (আ.) কিছুটা ভীত হলেন। তখন ফেরেশতারা বললেন,

> "ভয় করবেন না।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৬৯–৭০

এরপর তাঁরা ইবরাহিম (আ.)-কে জানালেন,

> "আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।"
>
> — সূরা আল-হিজর, ১৫:৫৩

ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রী সারাহ (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন,

> "আমি কি সন্তান জন্ম দেব, অথচ আমি তো বৃদ্ধা, আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ?"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৭২

ফেরেশতারা বললেন,

> "আপনি কি আল্লাহর সিদ্ধান্তে বিস্মিত হচ্ছেন? আল্লাহর রহমত ও বরকত আপনাদের পরিবারের ওপর বর্ষিত হোক।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৭৩

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য হলো। নির্ধারিত সময়ে ইবরাহিম (আ.)-এর ঘরে জন্ম নিলেন ইসহাক (আ.)।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবেরও।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৭১

অর্থাৎ শুধু একজন সন্তানেরই নয়, বরং একটি বরকতময় নবুওয়াতের ধারারও সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

ইসহাক (আ.) আল্লাহর মনোনীত একজন নবী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর তাওহীদের দাওয়াতকেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি তাঁকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছিলাম। আর প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মশীল বানিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে আমার নির্দেশে পথপ্রদর্শনকারী নেতা বানিয়েছিলাম।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৭২–৭৩

ইসহাক (আ.)-এর ঘরেই জন্ম নিলেন তাঁর পুত্র ইয়াকুব (আ.), যিনি পরবর্তীকালে ইসরাঈল নামে পরিচিত হন। তাঁর বংশধরদেরই বলা হয় বনি ইসরাঈল।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি তাঁকে ইসহাক দান করলাম, আর অতিরিক্ত হিসেবে ইয়াকুবকে। আর প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মশীল বানিয়েছিলাম।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৭২

ইয়াকুব (আ.)-ও ছিলেন আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী। তিনি তাঁর সন্তানদের অন্তরে তাওহীদের শিক্ষা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মৃত্যুর সময় তিনি সন্তানদের জিজ্ঞাসা করলেন,

> "আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত করবে?"

তাঁরা উত্তর দিল,

> "আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য—একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব। আর আমরা তাঁরই অনুগত।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১৩৩

এটি ছিল একজন পিতার সবচেয়ে বড় চিন্তা। তিনি সম্পদ, জমি বা রাজত্বের কথা জিজ্ঞাসা করেননি; বরং সন্তানদের ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।

কুরআনের আরেক স্থানে আল্লাহ ইবরাহিম (আ.), ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)-এর বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।

> "তারা ছিল আমার নির্বাচিত বান্দা, দৃঢ়সংকল্প ও প্রজ্ঞার অধিকারী। আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণে বিশেষিত করেছিলাম—আখিরাতের স্মরণ। আর তারা আমার কাছে ছিল মনোনীত ও উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:৪৫–৪৭

ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, প্রকৃত উত্তরাধিকার সম্পদ নয়—ঈমান। একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো, সে নিজের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়ে যেতে পারে।

এই পিতা-পুত্রের জীবন আরও প্রমাণ করে, আল্লাহ চাইলে একটি পরিবারকেও হিদায়াত ও নবুওয়াতের বরকতে ধন্য করতে পারেন। তবে সেই মর্যাদার ভিত্তি ছিল বংশ নয়; ছিল ঈমান, আনুগত্য ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা।

আজও প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জন্য ইয়াকুব (আ.)-এর শেষ প্রশ্নটি একটি শিক্ষা—আমরা কি আমাদের সন্তানদের দুনিয়ার সফলতার চেয়ে ঈমানের সফলতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি?

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ইউসুফ (আ.)—ধৈর্য, ক্ষমা ও আল্লাহর অপূর্ব পরিকল্পনার এক অনন্য কাহিনি।

তৃতীয় অংশ

ধৈর্য ও ন্যায়ের নবীগণ

ইউসুফ, আইয়ূব ও শু'আইব (আ.)

পর্ব ১০ – ১২

প র্ব

১০

ইউসুফ (আ.)

ধৈর্য, ক্ষমা ও আল্লাহর অপূর্ব পরিকল্পনা

কিছু মানুষের জীবন কুরআনে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে, আবার কিছু নবীর জীবনে কুরআন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। মহান আল্লাহ এ ঘটনাকে নিজেই "সর্বোত্তম কাহিনি" বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি আপনার নিকট সুন্দরতম কাহিনী বর্ণনা করছি, এ কুরআন আমার ওহী হিসেবে আপনার কাছে প্রেরণ করার মাধ্যমে। যদিও আপনি এর পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:৩

ইউসুফ (আ.) ছিলেন ইয়াকুব (আ.)-এর প্রিয় পুত্র। একদিন তিনি একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখলেন। তিনি পিতাকে বললেন,

> "হে আমার পিতা! আমি স্বপ্নে দেখেছি, এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদ—সবাই আমাকে সিজদা করছে।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:৪

ইয়াকুব (আ.) বুঝতে পারলেন, এটি সাধারণ স্বপ্ন নয়। তিনি স্নেহভরে বললেন,

> "হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নটি তোমার ভাইদের কাছে বলো না। তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।"

— সূরা ইউসুফ, ১২:৫

কিন্তু ভাইদের অন্তরে ইতোমধ্যেই হিংসা জন্ম নিয়েছিল। তারা বলল,

> "ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:৮

অবশেষে তারা ভয়ংকর পরিকল্পনা করল। পিতার অনুমতি নিয়ে ইউসুফ (আ.)-কে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি গভীর কূপে ফেলে দিল। (সূরা ইউসুফ, ১২:১৫)

ফিরে এসে তারা মিথ্যা গল্প বানাল। বলল, নেকড়ে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আর প্রমাণ হিসেবে একটি জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এল। (সূরা ইউসুফ, ১২:১৭–১৮)

ইয়াকুব (আ.) তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি শুধু বললেন,

> "বরং তোমাদের মনই তোমাদের জন্য একটি বিষয়কে সহজ করে দিয়েছে। অতএব, উত্তম ধৈর্যই আমার অবলম্বন।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:১৮

এদিকে আল্লাহ ইউসুফ (আ.)-কে একা ছেড়ে দেননি। একটি কাফেলা কূপের কাছে এসে পানি তুলতে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করল। পরে তাঁকে মিসরে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হলো। (সূরা ইউসুফ, ১২:১৯–২১)

মিসরের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁকে নিজের ঘরে লালন-পালনের ব্যবস্থা করলেন।

যৌবনে পৌঁছানোর পর আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলেন। (সূরা ইউসুফ, ১২:২২)

কিন্তু তখন তাঁর জীবনে আরেকটি কঠিন পরীক্ষা এল। তাঁর মনিবের স্ত্রী তাঁকে পাপের দিকে আহ্বান করল। ইউসুফ (আ.) দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

> "আল্লাহর আশ্রয় চাই! তিনি (আমার মনিব) আমাকে উত্তমভাবে রেখেছেন। নিশ্চয়ই জালিমরা কখনো সফল হয় না।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:২৩

মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো। (সূরা ইউসুফ, ১২:৩৫)

কারাগারেও তিনি আল্লাহকে ভুলে যাননি। বন্দিদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন। (সূরা ইউসুফ, ১২:৩৬–৪০)

কয়েক বছর পরে মিসরের বাদশাহ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। কেউ তার ব্যাখ্যা দিতে পারল না। তখন কারাগার থেকে ইউসুফ (আ.)-এর কথা স্মরণ করা হলো।

আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন। জানালেন, সাত বছর প্রচুর ফসল হবে, এরপর আসবে সাত বছরের কঠিন দুর্ভিক্ষ। তাই প্রাচুর্যের সময় খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে। (সূরা ইউসুফ, ১২:৪৩–৪৯)

বাদশাহ তাঁর জ্ঞান, সততা ও প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হলেন। ইউসুফ (আ.)-কে দেশের খাদ্যভাণ্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হলো। (সূরা ইউসুফ, ১২:৫৪–৫৫)

দুর্ভিক্ষ শুরু হলে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ খাদ্য নিতে আসতে লাগল। একদিন তাঁর সেই ভাইয়েরাও এল, যারা একসময় তাঁকে কূপে ফেলে গিয়েছিল। (সূরা ইউসুফ, ১২:৫৮)

বিভিন্ন ঘটনার পর অবশেষে ইউসুফ (আ.) নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন।

তিনি বললেন,

> "আমি ইউসুফ, আর এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ কখনো সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:৯০

ভাইরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করল।

তখন ইউসুফ (আ.) এমন কথা বললেন, যা ক্ষমার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে—

> "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো ভর্ৎসনা নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:৯২

পরে ইয়াকুব (আ.)-সহ পুরো পরিবার মিসরে এলেন। ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতা-মাতাকে সম্মানের আসনে বসালেন। তখন তাঁর শৈশবের সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হলো।

তিনি বললেন,

> "হে আমার পিতা! এ-ই তো আমার আগের স্বপ্নের বাস্তব রূপ। আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:১০০

জীবনের শেষদিকে ইউসুফ (আ.) আল্লাহর কাছে এক হৃদয়স্পর্শী দোয়া করলেন—

> "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:১০১

ইউসুফ (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, মানুষের পরিকল্পনার ঊর্ধ্বে আল্লাহর পরিকল্পনাই সর্বোত্তম। কূপ, দাসত্ব, অপবাদ ও কারাগার—প্রতিটি কঠিন অধ্যায়ই ছিল আল্লাহর নির্ধারিত বৃহত্তর কল্যাণের অংশ।

এই কাহিনি আরও শেখায়, ধৈর্য কখনো বৃথা যায় না, পবিত্রতা কখনো মূল্যহীন হয় না এবং ক্ষমা মানুষের মর্যাদাকে আরও উঁচুতে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তার জন্য এমন পথ খুলে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
আইয়ূব (আ.)—দীর্ঘ পরীক্ষার মধ্যেও অবিচল ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি অটুট আস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

প র্ব

১১

আইয়ূব (আ.)

দীর্ঘ পরীক্ষার মাঝেও অবিচল ধৈর্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন কখনো কখনো তাঁকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করান। সেই পরীক্ষায় কেউ ভেঙে পড়ে, আবার কেউ আরও বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। নবীদের জীবনে এই সত্য বারবার ফুটে উঠেছে। আর ধৈর্যের কথা উঠলেই যে মহান নবীর নাম সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয়, তিনি হলেন আইয়ূব (আ.)।

কুরআন তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেনি। তবে যতটুকু বর্ণনা করেছে, তাতেই ধৈর্য, বিনয় ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার এক অপূর্ব শিক্ষা রয়েছে।

আইয়ূব (আ.) ছিলেন আল্লাহর অনুগত একজন নবী। আল্লাহ তাঁকে সম্পদ, পরিবার ও সুস্বাস্থ্য দান করেছিলেন। কিন্তু একের পর এক কঠিন পরীক্ষায় তিনি তাঁর অনেক সম্পদ হারালেন, প্রিয়জনদের হারালেন এবং দীর্ঘ সময় অসুস্থতায় ভুগলেন। তবুও তাঁর মুখে অভিযোগের একটি শব্দও শোনা যায়নি। তিনি আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

দীর্ঘ পরীক্ষার পর একদিন তিনি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর প্রতিপালকের কাছে দোয়া করলেন।

> "নিশ্চয়ই আমি কষ্টে আক্রান্ত হয়েছি, আর আপনিই তো সর্বাধিক দয়ালু।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৩

লক্ষ্য করুন, তিনি বলেননি—"হে আল্লাহ! কেন আমাকে এই কষ্ট দিলেন?" কিংবা "আমার কষ্ট দূর করে দিন।" বরং নিজের কষ্টের কথা উল্লেখ করে আল্লাহর অসীম দয়ার ওপর ভরসা প্রকাশ করেছিলেন।

আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

> "অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম। তাঁর কষ্ট দূর করে দিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ ও ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ হিসেবে তাঁকে তাঁর পরিবার এবং তাদের সঙ্গে আরও অনুরূপ দান করলাম।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৪

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ আইয়ূব (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন,

> "তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো। এটি শীতল পানিতে গোসল ও পান করার ব্যবস্থা।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:৪২

আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তিনি তা করলেন। আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করলেন এবং তাঁর কষ্ট দূর করে দিলেন।

কুরআন শুধু তাঁর দোয়া কবুলের কথাই বলেনি; তাঁর চরিত্রেরও এক অসাধারণ প্রশংসা করেছে।

আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। তিনি কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই তিনি সর্বদা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:৪৪

এটি এমন একটি প্রশংসা, যা স্বয়ং আল্লাহ তাঁর একজন বান্দার সম্পর্কে করেছেন।

সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> "যাদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়, তারা হলেন নবীগণ। তারপর যারা তাদের মতো, তারপর যারা তাদের মতো। মানুষকে তার দ্বীনের দৃঢ়তা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়।"

— জামে আত-তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৮ ; হাদিসটি সহিহ

আইয়ূব (আ.)-এর জীবন সেই হাদিসের বাস্তব উদাহরণ।

তাঁর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে অভিযোগ নয়, দোয়া করতে হয়। মানুষের সামনে নিজের দুঃখের কথা বারবার বলার পরিবর্তে আল্লাহর দরবারে বিনয়ী হওয়াই একজন মুমিনের প্রকৃত পরিচয়।

আজ আমরা সামান্য বিপদেই হতাশ হয়ে পড়ি। কখনো অসুস্থতা, কখনো আর্থিক সংকট, কখনো প্রিয়জন হারানোর কষ্ট আমাদের দুর্বল করে দেয়। কিন্তু আইয়ূব (আ.)-এর জীবন মনে করিয়ে দেয়—পরীক্ষা যত দীর্ঘই হোক, আল্লাহর রহমত তার চেয়েও বড়।

যে বান্দা ধৈর্য ধরে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর ওপর ভরসা রাখে, আল্লাহ কখনো তাকে ভুলে যান না। হয় এই দুনিয়াতেই তিনি উত্তম প্রতিদান দেন, নয়তো আখিরাতের জন্য এমন প্রতিদান সংরক্ষণ করেন, যা কল্পনারও অতীত।

আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনি তাই শুধু একজন অসুস্থ মানুষের গল্প নয়; এটি এমন এক ঈমানদারের ইতিহাস, যিনি সবকিছু হারিয়েও তাঁর প্রতিপালকের প্রতি আস্থা হারাননি।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
শুআইব (আ.): প্রতারণা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আহ্বান

প র্ব

১২

শু'আইব (আ.) ও মাদইয়ানবাসীর প্রতারণা, অন্যায় ও ন্যায়ের আহ্বান

মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন শুধু ইবাদতেই বিচ্যুতি আসে না; লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার এবং সামাজিক জীবনেও অন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এমনই এক সময়ে মাদইয়ান জাতির কাছে মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানিত নবী শু'আইব (আ.)-কে প্রেরণ করেন। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৫)

মাদইয়ানবাসীরা ব্যবসায় দক্ষ ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তাদের বাজারে আসত। কিন্তু তাদের একটি ভয়ংকর অভ্যাস ছিল—ওজনে ও পরিমাপে কম দেওয়া, মানুষের অধিকার নষ্ট করা এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা।

শু'আইব (আ.) স্নেহভরে তাদের বললেন,

> "হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। অতএব, তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করো, মানুষের জিনিস কম দিও না এবং পৃথিবীতে সংশোধনের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৫

তিনি আরও বললেন,

> "আমি তো তোমাদের সমৃদ্ধ অবস্থায় দেখছি। তবুও আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৮৪

শু'আইব (আ.) শুধু ইবাদতের দাওয়াত দেননি; তিনি অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> " অনুবাদ: ‘আর হে আমার কওম, মাপ ও ওযন পূর্ণ কর ইনসাফের সাথে এবং মানুষকে তাদের পণ্য কম দিও না; আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৮৫

কিন্তু সত্য সব সময় ক্ষমতাবানদের ভালো লাগে না।

তারা বিদ্রূপ করে বলল,

> "হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের উপাস্যগুলো ছেড়ে দেব অথবা আমাদের সম্পদের ব্যাপারে ইচ্ছামতো যা করি, তা ছেড়ে দেব ?"
>
> — সূরা হূদ, ১১:৮৭

তাদের ধারণা ছিল, ব্যবসায় প্রতারণা করা তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

শু'আইব (আ.) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন,

> "হে আমার জাতি! তোমরা ভেবে দেখো, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, তবে কি আমি সত্য গোপন করতে পারি ? আমি তোমাদের যে কাজ থেকে নিষেধ করি, নিজে তা করতে চাই না। আমি শুধু আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন চাই। আমার সাফল্য একমাত্র আল্লাহরই সাহায্যে। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাই।"

— সূরা হূদ, ১১:৮৮

তবুও তারা ঈমান আনল না। বরং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের জনপদ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিল।

তারা বলল,

> "হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অথবা তোমাদের আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৮

শু'আইব (আ.) দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,

> "আমরা কি তবুও তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব, যদিও আমরা তা অপছন্দ করি ?"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৮

অবশেষে আল্লাহর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলো।

প্রথমে তাদের ওপর তীব্র গরম নেমে এলো। এরপর তারা একটি মেঘের নিচে আশ্রয় নিল। তারা ভাবল, এটি তাদের জন্য স্বস্তি নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটিই ছিল আল্লাহর শাস্তির সূচনা। তারপর এক বিকট শব্দ এবং ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করল। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯১ ; সূরা হূদ, ১১:৯৪ ; সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:১৮৯)

কুরআন বলে,

> "অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯১

মহান আল্লাহ শু'আইব (আ.) এবং তাঁর সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীদের নিজ রহমতে রক্ষা করলেন। (সূরা হূদ, ১১:৯৪)

বিদায়ের সময় শু'আইব (আ.) অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে বললেন,

> "হে আমার জাতি! আমি তো তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। তাহলে অবিশ্বাসী জাতির জন্য আমি কেন দুঃখ করব?"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯৩

শু'আইব (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, ইসলাম শুধু মসজিদের ইবাদতের শিক্ষা দেয় না; বাজারের সততা, ব্যবসার ন্যায়, মানুষের অধিকার রক্ষা এবং সৎ লেনদেনেরও শিক্ষা দেয়। যে সমাজে প্রতারণা, দুর্নীতি ও অন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যায়, সেই সমাজের ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

একজন মুমিনের ঈমান শুধু সালাতে নয়, তার ওজন, পরিমাপ, ব্যবসা, প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের সঙ্গে আচরণেও প্রকাশ পায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে ইবাদতের পাশাপাশি মানুষের হকও যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
মূসা (আ.): এক নবীর জন্ম, এক জালিম শাসকের পতনের সূচনা।

চতুর্থ অংশ

মূসা ও হারুন (আ.)

ফিরআউনের মুখোমুখি, বনি ইসরাঈলের মুক্তি ও পরীক্ষা

পর্ব ১৩ – ২০

পর্ব

১৩

মূসা (আ.)

এক নবীর জন্ম, এক জালিম শাসকের পতনের সূচনা

মিসরের বুকে তখন রাজত্ব করছিল এক অত্যাচারী শাসক—ফিরআউন। ক্ষমতার নেশায় সে এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, নিজেকেই সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করত।

আল্লাহ বলেন,

> "সে বলেছিল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক।'"
>
> — সূরা আন-নাযিআত, ৭৯:২৪

ফিরআউন বনি ইসরাঈলকে কঠোর নির্যাতনের মধ্যে রেখেছিল। তাদের শ্রমে গড়ে উঠছিল তার রাজত্ব, কিন্তু বিনিময়ে তারা পাচ্ছিল দাসত্ব, অপমান ও নির্যাতন।

আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই ফিরআউন পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একদলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল। তাদের পুত্রদের হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:৪

এমন সময় আল্লাহ এমন এক পরিকল্পনা করলেন, যা কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি।

যে শিশুকে হত্যা করার জন্য ফিরআউন নির্দেশ দিয়েছিল, সেই শিশুই একদিন তার পতনের কারণ হবে।

সে শিশুই ছিলেন মূসা (আ.)।

মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করার পর আল্লাহ তাঁর মায়ের অন্তরে ওহির মাধ্যমে সাহস জাগিয়ে দিলেন।

> "আমি মূসার মায়ের প্রতি নির্দেশ দিলাম, 'তাকে দুধ পান করাও। এরপর যখন তার ব্যাপারে ভয় করবে, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিও। ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।'"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭

একজন মায়ের জন্য এর চেয়ে কঠিন পরীক্ষা আর কী হতে পারে? নিজের আদরের সন্তানকে একটি বাক্সে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া!

কিন্তু তিনি জানতেন, এটি কোনো মানুষের কথা নয়; এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

নদীর স্রোত সেই বাক্সটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ফিরআউনের প্রাসাদের কাছে।

আল্লাহ বলেন,

> "অতঃপর ফিরআউনের পরিবার তাকে তুলে নিল, যাতে সে তাদের জন্য শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:৮

কী আশ্চর্য আল্লাহর পরিকল্পনা!

যে রাজা হাজারো শিশুকে হত্যা করছিল, তার নিজের প্রাসাদেই নিরাপদে বড় হতে লাগল সেই শিশু, যার হাতে আল্লাহ একদিন তার ক্ষমতার অবসান ঘটাবেন।

ফিরআউনের স্ত্রী শিশুটিকে দেখে মমতায় আপ্লুত হলেন। তিনি বললেন,

> "এ শিশু আমার ও তোমার চোখের শীতলতা। তাকে হত্যা করো না। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করব।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:৯

এদিকে মূসা (আ.)-এর মা গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "মূসার মায়ের অন্তর শূন্য হয়ে গিয়েছিল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় না করতাম, তবে তিনি প্রায় সব প্রকাশ করেই ফেলতেন।"
>
> — সূরা আল -কাসাস, ২৮:১০

আল্লাহর আরেকটি নিদর্শন তখন প্রকাশ পেল। মূসা (আ.) কোনো ধাত্রী মায়ের দুধ পান করছিলেন না।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি আগেই তার জন্য সব ধাত্রী মায়ের দুধ হারাম করে দিয়েছিলাম।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:১২

ঠিক তখন মূসা (আ.)-এর বোন প্রাসাদের লোকদের বললেন,

> "আমি কি তোমাদের এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব, যারা এ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে এবং তার কল্যাণ কামনা করবে ?"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:১২

এভাবেই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো।

মূসা (আ.) নিজের মায়ের কাছেই ফিরে এলেন, তবে এবার তিনি আর সাধারণ মা নন; তিনি রাজপ্রাসাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ধাত্রী।

আল্লাহ বলেন,

> "এভাবে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর চোখ শীতল হয়, তিনি দুঃখ না করেন এবং জানতে পারেন যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৩

মূসা (আ.) বড় হতে লাগলেন ফিরআউনের প্রাসাদে। আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে নিজের তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলছিলেন।

তিনি বলেন,

> "আমি তোমার প্রতি আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা বর্ষণ করেছি, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৩৯

যৌবনে পৌঁছালে আল্লাহ তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলেন।

> "যখন তিনি পরিপূর্ণ যৌবনে পৌঁছলেন এবং পরিণত হলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৪

মূসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনাই আমাদের একটি অসাধারণ শিক্ষা দেয়। মানুষ যতই পরিকল্পনা করুক, চূড়ান্ত পরিকল্পনা আল্লাহরই। ফিরআউন ভেবেছিল, সে শিশুদের হত্যা করে নিজের ক্ষমতা রক্ষা করবে। অথচ আল্লাহ সেই শিশুকেই তার নিজের ঘরে লালন-পালনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই ঘটনা আমাদের আরও শেখায়, কখনো কখনো আল্লাহর নির্দেশ প্রথমে কঠিন মনে হয়, কিন্তু তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সবচেয়ে বড় কল্যাণ। যদি মূসা (আ.)-এর মা আল্লাহর ওপর ভরসা না করতেন, তবে হয়তো ইতিহাস অন্যরকম হতো।

যে রব নদীর স্রোতের মধ্যেও একটি শিশুকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারেন, তিনি তাঁর বান্দাদেরও এমনভাবে রক্ষা করতে পারেন, যা মানুষের কল্পনার বাইরে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
মূসা (আ.): মাদইয়ানে হিজরত, নবুওয়াত লাভ এবং ফিরআউনের সামনে সত্যের ঘোষণা।

প র্ব

১৪

মূসা (আ.)

মাদইয়ানে হিজরত, নবুওয়াত লাভ এবং ফিরআউনের সামনে সত্যের ঘোষণা

ফিরআউনের প্রাসাদে বড় হলেও মূসা (আ.) কখনো জুলুমের পক্ষ নেননি। একদিন শহরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন, একজন বনি ইসরাঈল এবং একজন কিবতী (ফিরআউনের সম্প্রদায়ের লোক) বিবাদে লিপ্ত। বনি ইসরাঈল ব্যক্তি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে মূসা (আ.) কিবতীকে একটি ঘুষি মারেন। কিন্তু সেই আঘাতেই লোকটি মারা যায়। (সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৫)

মূসা (আ.) সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৬

আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন। এরপর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৭

পরদিন আবার সেই একই ব্যক্তি সাহায্য চাইলে মূসা (আ.) তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তখন ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ল। ফিরআউনের দরবারে সিদ্ধান্ত হলো, মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হবে।

(সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৮–২০)

ঠিক সেই সময় একজন ঈমানদার ব্যক্তি শহরের দূর প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে বললেন,

> "হে মূসা! পরিষদের লোকেরা আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। তাই আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান। আমি আপনার মঙ্গলকামী।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:২০

মূসা (আ.) কোনো বিলম্ব না করে মিসর ত্যাগ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল না কোনো বাহিনী, কোনো সম্পদ, কোনো সঙ্গী।

তিনি শুধু দোয়া করলেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালিম জাতির হাত থেকে রক্ষা করুন।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:২১

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি মাদইয়ান অঞ্চলে পৌঁছলেন। সেখানে একটি কূপের পাশে দেখলেন, অনেক রাখাল তাদের পশুকে পানি পান করাচ্ছে। একটু দূরে দুই নারী তাদের পশুগুলোকে আটকে দাঁড়িয়ে আছেন।

মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন,

> "তোমাদের কী সমস্যা?"

তারা বললেন,

> "রাখালরা সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা খুব বৃদ্ধ।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৩

মূসা (আ.) নিজেই তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। তারপর ছায়ায় বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাজিল করবেন, আমি তারই মুখাপেক্ষী।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৪

কিছুক্ষণ পর সেই দুই নারীর একজন লজ্জাশীল ভঙ্গিতে এসে বললেন,

> "আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। আপনি আমাদের পশুকে পানি পান করিয়েছেন, তার প্রতিদান দেওয়ার জন্য।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৫

মূসা (আ.) তাঁদের পিতার কাছে গেলেন এবং নিজের ঘটনা খুলে বললেন। তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন,

> "ভয় করবেন না। আপনি জালিম জাতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৫

দুই কন্যার একজন তাঁর পিতাকে বললেন,

> "হে আমার পিতা! তাঁকে কাজে নিয়োগ করুন। কারণ আপনি যাকে কাজে নিয়োগ করবেন, তার মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৬

অবশেষে মূসা (আ.) তাঁদের এক কন্যাকে বিবাহ করলেন এবং আট বা দশ বছর সেখানে অবস্থান করলেন। (সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৭–২৮)

সময় পূর্ণ হওয়ার পর তিনি পরিবার নিয়ে মিসরের পথে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তূর পর্বতের পাশে তিনি একটি আগুন দেখতে পেলেন। পরিবারকে বললেন,

> "তোমরা অপেক্ষা করো। আমি আগুন দেখেছি। হয়তো সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর বা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব।"

> — সূরা ত্বা-হা, ২০:১০; সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৯

কিন্তু সেখানে পৌঁছে তিনি এমন এক আহ্বান শুনলেন, যা মানবজাতির ইতিহাস বদলে দিয়েছিল।

আল্লাহ তাঁকে সম্বোধন করে বললেন,

> "হে মূসা! আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩০

আল্লাহ তাঁকে তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলতে বললেন। লাঠি মুহূর্তেই জীবন্ত সাপে পরিণত হলো। (সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩১)

এরপর তিনি হাত বগলে প্রবেশ করিয়ে বের করলে তা কোনো রোগ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। (সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩২)

এ দুটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা (আ.)-এর মুজিযা।

এরপর আল্লাহ তাঁকে বললেন,

> "তুমি ফিরআউনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:২৪

মূসা (আ.) তখন সেই বিখ্যাত দোয়াটি করলেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমার ভাই হারূনকে আমার সহকারী বানিয়ে দিন।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:২৫–৩২

আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং হারূন (আ.)-কে তাঁর সহকারী নবী হিসেবে মনোনীত করলেন। (সূরা ত্বা-হা, ২০:৩৬; সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩৪–৩৫)

এরপর দুই ভাই আল্লাহর নির্দেশে ফিরআউনের দরবারে উপস্থিত হলেন।

আল্লাহ তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন,

> "তোমরা তার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৪৪

একজন সাধারণ রাখাল এবং তাঁর ভাই—দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে গেলেন পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী শাসকের সামনে। তাঁদের হাতে ছিল না কোনো অস্ত্র, কোনো সেনাবাহিনী বা ক্ষমতা। ছিল শুধু আল্লাহর ওহি এবং সত্যের শক্তি।

মূসা (আ.)-এর এই অধ্যায় আমাদের শেখায়, আল্লাহ যাকে দায়িত্ব দেন, তাকেই সেই দায়িত্ব পালনের শক্তিও দান করেন। একটি ভুলের পর তাওবা, নির্বাসনের পর আশ্রয়, একাকীত্বের পর পরিবার, আর একজন পলাতক মানুষের হাতেই আল্লাহ নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কখনো কখনো জীবনের সবচেয়ে কঠিন পথই আল্লাহর সবচেয়ে বড় পরিকল্পনার সূচনা হয়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
মূসা (আ.) ও ফিরআউন: সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মুখোমুখি সংঘর্ষ।

পর্ব

১৫

মূসা (আ.) ও ফিরআউন

সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মুখোমুখি সংঘর্ষ

মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ফিরআউনের দরবারে প্রবেশ করলেন। সামনে বসে আছে সেই শাসক, যে নিজেকে মানুষের সর্বোচ্চ প্রতিপালক বলে দাবি করে। তার চারপাশে মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজদরবারের প্রভাবশালী লোকেরা।

মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে নির্ভয়ে বললেন,

> "আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। অতএব, বনি ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন এবং তাদের ওপর নির্যাতন করবেন না। আমরা আপনার কাছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৪৭

ফিরআউন অহংকারভরে বলল,

> "বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কে ?"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২৩

মূসা (আ.) উত্তর দিলেন,

> "তিনি আসমান, জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২৪

কিন্তু সত্য গ্রহণ করার পরিবর্তে ফিরআউন বিদ্রূপ করতে লাগল। সে মূসা (আ.)-এর শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল,

> "আমরা কি তোমাকে আমাদের কাছেই শিশু অবস্থায় লালন-পালন করিনি ? আর তুমি আমাদের মধ্যে বহু বছর অবস্থান করেছিলে ?"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:১৮

মূসা (আ.) অতীতের ঘটনাকে অস্বীকার করলেন না। বরং সত্য স্বীকার করে বললেন,

> "হ্যাঁ, তখন আমি তা করেছিলাম, যখন আমি ছিলাম ভুলকারীদের একজন। তারপর আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, যখন তোমাদের ভয় করেছিলাম। এরপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২০–২১

সত্যবাদীর পরিচয় এটাই—নিজের ভুল গোপন না করে স্বীকার করা।

এরপর ফিরআউন মূসা (আ.)-এর দাবিকে অস্বীকার করে বলল,

> "যদি তুমি কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তবে তা উপস্থিত করো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১০৬

মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তেই তা একটি জীবন্ত বিশাল সাপে পরিণত হলো। এরপর তিনি তাঁর হাত বের করলে তা উজ্জ্বল আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠল। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১০৭–১০৮)

দরবারের সবাই বিস্মিত হয়ে গেল।

কিন্তু ফিরআউন সত্য মেনে নেওয়ার পরিবর্তে বলল,

> "এ তো একজন দক্ষ জাদুকর !"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১০৯

সে সিদ্ধান্ত নিল, সারা দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের ডেকে এনে মূসা (আ.)-কে পরাজিত করবে।

নির্ধারিত দিনে বহু মানুষ একত্রিত হলো। জাদুকররা ফিরআউনকে বলল,

> "আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে কি আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে?"

সে বলল,

> "অবশ্যই। তখন তোমরা আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১১৩–১১৪

জাদুকররা তাদের দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করল। মানুষের চোখে মনে হলো, সেগুলো সাপের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। (সূরা ত্বা-হা, ২০:৬৬)

সেই দৃশ্য দেখে মূসা (আ.)-এর মনে সাময়িক ভয় জাগল।

তখন আল্লাহ বললেন,

> "ভয় করো না। নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী হবে।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৬৮

আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা জাদুকরদের বানানো সব মিথ্যা কৌশল গ্রাস করে ফেলল।

> "অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিল, সবই মিথ্যা প্রমাণিত হলো।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১১৮

জাদুকররা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেল, এটি কোনো জাদু নয়; এটি আল্লাহর মুজিযা।

তারা সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ঘোষণা করল,

> "আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম—মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১২০–১২২

ফিরআউন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল।

সে বলল,

> "আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা ঈমান এনেছ? আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং খেজুর গাছে ঝুলিয়ে দেব।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৭১

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত আগেও যারা দুনিয়ার পুরস্কারের আশায় এসেছিল, ঈমান তাদের হৃদয় বদলে দিল।

তারা দৃঢ়ভাবে বলল,

> "আমরা কখনো তোমাকে সেই সুস্পষ্ট নিদর্শনের ওপর প্রাধান্য দেব না, যা আমাদের কাছে এসেছে, এবং সেই সত্তার ওপরও নয়, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তুমি যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নাও। তুমি তো কেবল এ দুনিয়ার জীবন সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত নিতে পারো। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করেন।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৭২–৭৩

একটি মুহূর্তে তাদের জীবন বদলে গেল। যারা পুরস্কারের আশায় এসেছিল, তারা শহীদের মর্যাদা লাভের জন্যও প্রস্তুত হয়ে গেল।

মূসা (আ.)-এর এই অধ্যায় আমাদের শেখায়, সত্যের শক্তি কখনো বাহ্যিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। ফিরআউনের ছিল রাজত্ব, সেনাবাহিনী ও ক্ষমতা; কিন্তু মূসা (আ.)-এর ছিল আল্লাহর সাহায্য। আর আল্লাহর সাহায্যের সামনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিও পরাজিত হয়।

এই ঘটনাটি আরও শেখায়, একজন মানুষ যত বড় পাপীই হোক না কেন, সত্যকে চিনে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলে আল্লাহ তাকে সম্মানিত বানাতে পারেন। ফিরআউনের জাদুকররা তারই অনুগত ছিল, কিন্তু সত্য উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঈমানের সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেল।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈলের মুক্তি: সাগর দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং ফিরআউনের করুণ পরিণতি।

পর্ব

১৬

মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈলের মুক্তি

সাগর দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং ফিরআউনের করুণ পরিণতি

ফিরআউনের জাদুকররা ঈমান আনার পরও সে তার অহংকার থেকে ফিরে আসেনি। বরং বনি ইসরাঈলের ওপর নির্যাতন আরও বাড়িয়ে দিল। আল্লাহর একের পর এক নিদর্শনও তার হৃদয়কে নরম করতে পারল না।

আল্লাহ ফিরআউনের জাতির ওপর সতর্কবার্তা হিসেবে দুর্ভিক্ষ, ফসলের ক্ষতি, বন্যা, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্তের মতো বিভিন্ন নিদর্শন পাঠিয়েছিলেন। প্রতিবারই তারা বিপদে পড়ে মূসা (আ.)-এর কাছে দোয়া চাইত। বিপদ দূর হয়ে গেলে আবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত এবং কুফরিতেই ফিরে যেত। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৩০–১৩৫)

অবশেষে আল্লাহ মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন,

> "আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়ো। নিশ্চয়ই তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৫২

রাতের অন্ধকারে মূসা (আ.) বনি ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করলেন। কিন্তু খবর পেয়ে ফিরআউন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পিছু নিল। (সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৫৩–৫৬)

ভোরের আলো ফুটতেই দুই দল একে অপরকে দেখতে পেল।

সামনে বিশাল সমুদ্র, আর পেছনে ফিরআউনের সশস্ত্র বাহিনী।

বনি ইসরাঈল আতঙ্কিত হয়ে বলল,

> "নিশ্চয়ই তারা আমাদের ধরে ফেলবে!"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬১

কিন্তু মূসা (আ.)-এর অন্তরে ছিল অটুট ঈমান। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

> "কখনোই নয়। নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬২

এটি ছিল তাওয়াক্কুলের এক অবিস্মরণীয় ঘোষণা।

তখন আল্লাহ মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন,

> "তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো।"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬৩

মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পালন করলেন।

মুহূর্তেই সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। কুরআন বলে,

> "অতঃপর সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে গেল, আর প্রতিটি অংশ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল।"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬৩

সমুদ্রের মাঝখানে শুকনো পথ তৈরি হলো।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি সমুদ্রকে শুকনো পথ করে দিয়েছিলাম। সেখানে তোমার ডুবে যাওয়ার বা ভয় পাওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না।"

> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৭৭

মূসা (আ.) এবং ঈমানদাররা নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন।

কিন্তু ফিরআউন অহংকারে অন্ধ হয়ে সেই পথেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করল।

যখন সবাই সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহর নির্দেশে পানি আবার আগের অবস্থায় ফিরে এল।

আল্লাহ বলেন,

> "অতঃপর সমুদ্র তাদের ঢেকে ফেলল, যেমনভাবে ঢেকে ফেলার ছিল।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৭৮

ফিরআউন এবং তার বিশাল বাহিনী মুহূর্তের মধ্যেই পানিতে ডুবে গেল।

মৃত্যু নিশ্চিত দেখে ফিরআউন বলল,

> "আমি ঈমান আনলাম যে, বনি ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"
>
> — সূরা ইউনুস, ১০:৯০

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আল্লাহ বললেন,

> "এখন ঈমান আনছ ? অথচ এর আগে তুমি অবাধ্যতা করেছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে !"
>
> — সূরা ইউনুস, ১০:৯১

এরপর আল্লাহ একটি বিশেষ ঘোষণা দিলেন,

> "আজ আমি তোমার দেহ সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। কিন্তু অনেক মানুষই আমার নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন।"

— সূরা ইউনুস, ১০:৯২

এভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকের পরিণতি হলো অত্যন্ত করুণ। যে নিজেকে সর্বোচ্চ প্রতিপালক দাবি করেছিল, সে নিজের জীবনও রক্ষা করতে পারল না।

অন্যদিকে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন।

> "আমি মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে রক্ষা করলাম। তারপর অন্যদের ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে বড় নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনি।"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬৫–৬৭

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, সত্যের পথে চলতে গিয়ে কখনো এমন পরিস্থিতি আসতে পারে, যখন সব পথ বন্ধ মনে হবে। কিন্তু আল্লাহর জন্য কোনো পথই বন্ধ নয়। মানুষ যেখানে শুধু সমুদ্র দেখে, আল্লাহ সেখানে পথ সৃষ্টি করেন।

এ ঘটনাটি আরও শেখায়, তাওবা করার সময় জীবিত অবস্থায়, সুযোগ থাকা অবস্থায়। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে করা ঈমান বা তাওবা কোনো উপকারে আসে না।

ফিরআউনের পরিণতি আজও পৃথিবীর সব জালিমের জন্য সতর্কবার্তা, আর মূসা (আ.)-এর অটল ঈমান সব মুমিনের জন্য অনুপ্রেরণা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈল: অবাধ্যতা, বাছুর পূজা এবং আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ।

প র্ব

১৭

মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈল

অবাধ্যতা, বাছুর পূজা এবং আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ

আল্লাহ ফিরআউন ও তার বাহিনীকে ধ্বংস করে বনি ইসরাঈলকে মুক্তি দিলেন। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে তারা স্বাধীন হলো। সমুদ্র তাদের জন্য পথ হয়ে গেল, আর তাদের চোখের সামনেই সবচেয়ে বড় জালিমের পতন ঘটল।

কিন্তু মানুষ সব সময় নিয়ামতের মূল্য দেয় না। সমুদ্র পার হওয়ার পরই বনি ইসরাঈলের অন্তরের দুর্বলতা প্রকাশ পেতে শুরু করল।

পথে তারা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গেল, যারা মূর্তিপূজায় মগ্ন ছিল। সেই দৃশ্য দেখে তারা মূসা (আ.)-কে বলল,

> "হে মূসা! তাদের যেমন উপাস্য আছে, আমাদের জন্যও তেমন একজন উপাস্য বানিয়ে দিন।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৩৮

মূসা (আ.) অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন,

> "তোমরা তো এক মূর্খ জাতি! এরা যে কাজে লিপ্ত আছে, তা ধ্বংস হওয়ারই বিষয় এবং তারা যা করছে, সবই বাতিল। আমি কি আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপাস্য খুঁজে দেব, অথচ তিনিই তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?"

— সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৩৮–১৪০

এরপর আল্লাহ মূসা (আ.)-কে তূর পর্বতে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে ত্রিশ রাত, পরে আরও দশ রাত যোগ করে মোট চল্লিশ রাত নির্ধারণ করা হলো। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪২)

রওনা হওয়ার আগে তিনি তাঁর ভাই হারূন (আ.)-কে বললেন,

> "আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হও, সংশোধনের কাজ করো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪২

মূসা (আ.) তূর পর্বতে থাকাকালীন সামিরী নামে এক ব্যক্তি মানুষের ঈমানকে বিভ্রান্ত করল। সে মানুষের স্বর্ণালংকার সংগ্রহ করে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি করল, যা থেকে গরুর মতো শব্দ বের হতো।

সে বলল,

> "এটাই তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য; কিন্তু মূসা ভুলে গেছে।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৮৮

অনেকেই তার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে সেই বাছুরের পূজা শুরু করল।

হারূন (আ.) তাদের বারবার সতর্ক করলেন।

তিনি বললেন,

> "হে আমার জাতি! তোমরা তো এর মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়েছ। তোমাদের প্রতিপালক তো একমাত্র পরম করুণাময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার নির্দেশ মেনে চলো।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯০

কিন্তু তারা জবাব দিল,

> "মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা করতেই থাকব।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯১

এদিকে তূর পর্বতে আল্লাহ মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি তাঁর জন্য ফলকসমূহে সব বিষয়ে উপদেশ এবং সব কিছুর বিস্তারিত লিখে দিয়েছিলাম।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪৫

আল্লাহ আরও জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর সম্প্রদায় পরীক্ষায় পড়েছে।

মূসা (আ.) অত্যন্ত দুঃখ ও ক্রোধ নিয়ে ফিরে এলেন।

তিনি বললেন,

> "আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কতই না নিকৃষ্ট কাজ করেছ!"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫০

তিনি হারূন (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি তাদের থামাতে পারলেন না।

হারূন (আ.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন,

> "হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরবেন না। আমি আশঙ্কা করেছিলাম, আপনি বলবেন—'তুমি বনি ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ।'"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৪

তখন মূসা (আ.) বুঝতে পারলেন, হারূন (আ.) তাঁর সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছেন।

এরপর তিনি সামিরীকে জিজ্ঞাসা করলেন,

> "হে সামিরী! তোমার উদ্দেশ্য কী ছিল?"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৫

সামিরী নিজের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করল। তখন মূসা (আ.) তাকে বললেন,

> "চলে যাও। তোমার জন্য দুনিয়ায় শাস্তি হলো—তুমি বলতেই থাকবে, 'আমাকে স্পর্শ করো না।' আর তোমার জন্য নির্ধারিত শাস্তি তো আছেই। আর দেখো, তোমার সেই উপাস্যকে আমরা জ্বালিয়ে দেব, তারপর তা গুঁড়ো করে সমুদ্রে ছড়িয়ে দেব।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৭

এরপর মূসা (আ.) ঘোষণা করলেন,

> "তোমাদের প্রকৃত উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৮

বনি ইসরাঈলের এই ঘটনা আমাদের শেখায়, শুধু অলৌকিক নিদর্শন দেখা ঈমানের নিশ্চয়তা নয়। ফিরআউনের ডুবে যাওয়া, সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া—সব নিজের চোখে দেখার পরও তারা খুব দ্রুত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই ঈমানকে টিকিয়ে রাখতে জ্ঞান, ধৈর্য এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য অপরিহার্য।

এই ঘটনাটি আরও শেখায়, একজন দাঈ বা নেতা মানুষের ভুল দেখলে তাকে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। কিন্তু হিদায়াত দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈল: পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের নির্দেশ, অবাধ্যতা এবং চল্লিশ বছরের মরুপ্রান্তরের পরীক্ষা।

পর্ব

১৮

মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈল

পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের নির্দেশ, অবাধ্যতা এবং চল্লিশ বছরের মরুপ্রান্তরের পরীক্ষা

আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে ফিরআউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত করে নিরাপদে পার করেছিলেন এবং তাওরাতের মতো মহান কিতাব দান করেছিলেন। এতসব নিয়ামতের পর এবার তাদের সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এলো।

আল্লাহ মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর জাতিকে নিয়ে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেন—যে ভূমি আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন।

মূসা (আ.) বললেন,

> "হে আমার জাতি! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর তোমরা পেছনে ফিরে যেয়ো না; অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।"
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২১

কিন্তু বনি ইসরাঈল সাহসের পরিবর্তে ভয়কে বেছে নিল।

তারা বলল,

> "হে মূসা! সেখানে এক শক্তিশালী জাতি রয়েছে। তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে আমরা প্রবেশ করব।"

— সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২২

তাদের মধ্যে দুজন ঈমানদার ও সাহসী ব্যক্তি—যাদের ওপর আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন—মানুষকে ভরসা রাখতে উৎসাহ দিলেন।

তারা বললেন,

> "তোমরা দরজা দিয়ে তাদের ওপর প্রবেশ করো। যখন সেখানে প্রবেশ করবে, তখন অবশ্যই তোমরাই বিজয়ী হবে। আর যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহরই ওপর ভরসা করো।"
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৩

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাদের কথাও মানল না।

বরং তারা এমন একটি কথা বলল, যা তাদের অবাধ্যতার চরম প্রকাশ ছিল।

তারা বলল,

> "হে মূসা! তারা সেখানে থাকা পর্যন্ত আমরা কখনো প্রবেশ করব না। অতএব, আপনি ও আপনার প্রতিপালক যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম।"
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৪

এ কথা শুনে মূসা (আ.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কেবল নিজের এবং আমার ভাইয়ের ওপরই ক্ষমতা রাখি। অতএব, আমাদের এবং এই অবাধ্য জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন।"
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৫

আল্লাহ তাদের এই অবাধ্যতার পরিণতি ঘোষণা করলেন।

> "আল্লাহ বললেন, 'এ ভূমি তাদের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। অতএব, আপনি এই অবাধ্য জাতির জন্য দুঃখ করবেন না।'"
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৬

এভাবেই তারা চল্লিশ বছর মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হলো। যে জাতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করতে পারল না, তারা নিজেরাই সেই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলো।

তবুও আল্লাহ তাঁর রহমত তাদের থেকে পুরোপুরি ফিরিয়ে নেননি।

মরুভূমির প্রখর রোদে তিনি মেঘের ছায়া দান করলেন।

> "আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া করেছি এবং তোমাদের জন্য মান্না ও সালওয়া নাজিল করেছি।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৫৭

যখন তারা পানির অভাবে কষ্ট পেল, তখন আল্লাহ মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন,

> "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো।"

তিনি আঘাত করতেই পাথর থেকে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র তাদের নিজ নিজ পানির স্থান জেনে নিল। (সূরা আল-বাকারা, ২:৬০)

কিন্তু এত নিয়ামত পাওয়ার পরও তারা কৃতজ্ঞ হতে পারল না।

তারা বলল,

> "হে মূসা! আমরা এক ধরনের খাদ্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য জমিনের উৎপন্ন শাকসবজি, শসা, রসুন, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপন্ন করেন।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৬১

মূসা (আ.) বললেন,

> "তোমরা কি উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিম্নমানের জিনিস গ্রহণ করতে চাও ?"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৬১

আল্লাহ তাদের অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে ভর্ৎসনা করলেন। কারণ তারা বারবার আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতকে অবহেলা করছিল।

মূসা (আ.)-এর জীবনের এই অধ্যায় আমাদের শেখায়, শুধু আল্লাহর নিয়ামত পাওয়াই যথেষ্ট নয়; সেই নিয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন ও আল্লাহর নির্দেশ মানাই প্রকৃত ঈমানের পরিচয়।

এ ঘটনাটি আরও শিক্ষা দেয়, ভয় ও দুর্বলতা মানুষকে অনেক বড় নিয়ামত থেকেও বঞ্চিত করতে পারে। অন্যদিকে, আল্লাহর ওপর ভরসা একজন দুর্বল মানুষকেও বিজয়ী করতে পারে।

বনি ইসরাঈল বারবার ভুল করলেও আল্লাহ তাদের তাওবার সুযোগ দিয়েছেন, রিযিক দিয়েছেন এবং পথ দেখিয়েছেন। এতে আল্লাহর অসীম দয়া যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি এটিও স্পষ্ট হয় যে, বারবার অবাধ্যতা মানুষের জন্য কঠিন পরিণতি ডেকে আনে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
মূসা (আ.) ও খিজির: আল্লাহর গোপন হিকমতের এক বিস্ময়কর শিক্ষা।

পর্ব

১৯

মূসা (আ.) ও খিজির

আল্লাহর গোপন হিকমতের এক বিস্ময়কর শিক্ষা

মূসা (আ.) ছিলেন উলুল আযম নবীদের একজন। আল্লাহ তাঁকে তাওরাত দান করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সম্মান দিয়েছিলেন। তবুও তিনি জানতেন, জ্ঞানের প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ।

একদিন বনি ইসরাঈলের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

— "পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে?"

তিনি বললেন,

— "আমি।"

মূসা (আ.)-এর এই উত্তর আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হলো না, কারণ তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে সমর্পণ করেননি। তখন আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর একজন বান্দা আছেন, যাকে এমন কিছু জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যা মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়নি। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১২২)

মূসা (আ.) সঙ্গে সঙ্গে বললেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আমি কীভাবে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারি?"

আল্লাহ তাঁকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের নির্দেশ দিলেন, যেখানে দুই সাগরের মিলনস্থলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১২২; সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬০)

মূসা (আ.) তাঁর যুবক সঙ্গী ইউশা ইবন নূনকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ সফরে বের হলেন।

তিনি বললেন,

> "দুই সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি চলতেই থাকব, প্রয়োজনে যুগের পর যুগ।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬০

নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে তারা বিশ্রাম নিলেন। তাদের সঙ্গে থাকা মাছটি অলৌকিকভাবে জীবিত হয়ে পানিতে চলে গেল। কিন্তু তখন তারা বিষয়টি খেয়াল করেননি। (সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬১)

কিছুদূর যাওয়ার পর সঙ্গী বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলে মূসা (আ.) বললেন,

> "আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম!"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৪

তারা ফিরে এসে সেখানে আল্লাহর এক বিশেষ বান্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "অতঃপর তারা আমার বান্দাদের একজনকে পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৫

সহিহ হাদিসে তাঁর নাম খিজির বলে উল্লেখ এসেছে। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১২২)

মূসা (আ.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন,

> "আপনাকে যে সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৬

খিজির বললেন,

> "আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। যে বিষয়ের প্রকৃত রহস্য আপনার জানা নেই, সে বিষয়ে কীভাবে ধৈর্য ধরবেন?"

— সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৭–৬৮

মূসা (আ.) বললেন,

> "ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৯

খিজির একটি শর্ত দিলেন,

> "আমি নিজে ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত আপনি আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭০

এরপর শুরু হলো এক বিস্ময়কর সফর।

প্রথমে তারা একটি নৌকায় উঠলেন। মাঝপথে খিজির নৌকাটিতে একটি ছিদ্র করে দিলেন।

মূসা (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন,

> "আপনি কি এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকাটি ক্ষতিগ্রস্ত করলেন? আপনি তো এক অদ্ভুত কাজ করলেন!"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭১

খিজির শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন,

> "আমি কি বলিনি, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না?"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭২

মূসা (আ.) ক্ষমা চেয়ে বললেন,

> "আমার ভুলের জন্য আমাকে ধরবেন না।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৩

পরে তারা একটি বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। খিজির তাকে হত্যা করলেন।

মূসা (আ.) আরও বিস্মিত হয়ে বললেন,

> "আপনি কি কোনো অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন? এটি তো অত্যন্ত গুরুতর কাজ!"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৪

খিজির আবারও বললেন,

> "আমি কি বলিনি, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না?"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৫

মূসা (আ.) বললেন,

> "এরপর যদি আমি আর কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৬

এরপর তারা একটি জনপদে পৌঁছালেন। সেখানে তারা খাদ্য চাইলেন, কিন্তু অধিবাসীরা তাদের আতিথ্য করল না।

তবুও খিজির সেখানে একটি ভেঙে পড়া দেয়াল বিনা পারিশ্রমিকে মেরামত করে দিলেন।

মূসা (আ.) বললেন,

> "আপনি চাইলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৭

এবার খিজির বললেন,

> "এখানেই আমার ও আপনার বিচ্ছেদ। এখন আমি আপনাকে সেই বিষয়গুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিয়ে দিচ্ছি।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৮

তিনি বললেন, নৌকাটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র মানুষের। সামনে এমন এক অত্যাচারী রাজা ছিল, যে সব ভালো নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে নিত। তাই সামান্য ক্ষতি করে নৌকাটিকে বড় ক্ষতি থেকে

রক্ষা করা হয়েছিল। (সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৯)

আর যে বালককে হত্যা করা হয়েছিল, সে বড় হয়ে ঈমানদার পিতা-মাতাকে অবাধ্যতা ও কুফরির দিকে ঠেলে দিত। আল্লাহ চেয়েছিলেন, তার পরিবর্তে তাদের আরও উত্তম ও পবিত্র সন্তান দান করতে। (সূরা আল-কাহফ, ১৮:৮০–৮১)

আর যে দেয়ালটি মেরামত করা হয়েছিল, তার নিচে দুই এতিম শিশুর সম্পদ গচ্ছিত ছিল। তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎ মানুষ। আল্লাহ চেয়েছিলেন, তারা বড় হওয়ার আগে যেন সেই সম্পদ নষ্ট না হয়ে যায়। (সূরা আল-কাহফ, ১৮:৮২)

সবশেষে খিজির বললেন,

> "আমি এসব আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি।"
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৮২

অর্থাৎ, সবই ছিল আল্লাহর নির্দেশে।

মূসা (আ.) ও খিজিরের এই ঘটনা আমাদের শেখায়, আমরা জীবনের অনেক ঘটনার পেছনের হিকমত সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি না। কখনো কোনো ক্ষতি, কোনো কষ্ট বা কোনো অপূর্ণতাই হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আরও বড় কল্যাণের সূচনা।

তাই একজন মুমিনের কর্তব্য হলো—আল্লাহর ফয়সালার ওপর আস্থা রাখা, ধৈর্য ধারণ করা এবং বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর জ্ঞান সীমাহীন, আর মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
হারূন (আ.): মূসা (আ.)-এর বিশ্বস্ত সহচর ও একজন সম্মানিত নবী।

প র্ব

২০

হারূন (আ.)

মূসা (আ.)-এর বিশ্বস্ত সহচর ও একজন সম্মানিত নবী

আল্লাহ যখন কোনো মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন সেই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যও তিনি দান করেন। মূসা (আ.)-এর জীবনে সেই মহান সাহায্যের নাম ছিল তাঁর বড় ভাই—হারূন (আ.)।

তিনি শুধু একজন ভাইই ছিলেন না; তিনি ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত একজন নবী, সত্যের একজন অকুতোভয় দাঈ এবং মূসা (আ.)-এর বিশ্বস্ত সহচর।

মূসা (আ.) যখন তূর পর্বতে নবুওয়াত লাভ করেন এবং ফিরআউনের কাছে যাওয়ার আদেশ পান, তখন তিনি নিজের একটি দুর্বলতার কথা আল্লাহর কাছে তুলে ধরলেন। তিনি অনুভব করতেন, তাঁর কথাবার্তায় কিছু জড়তা রয়েছে। তাই তিনি দোয়া করলেন,

> "আর আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন সহকারী নির্ধারণ করুন—আমার ভাই হারূনকে। তাঁর মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাঁকে আমার কাজে শরিক করুন।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:২৯–৩২

অন্যত্র তিনি বলেন,

> "আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাষী। তাই তাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠান, যাতে সে আমাকে সমর্থন করে।"

— সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩৪

আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর এই দোয়া কবুল করলেন।

তিনি বললেন,

"হে মূসা! তোমার আবেদন কবুল করা হয়েছে।"

— সূরা ত্বা-হা, ২০:৩৬

এভাবেই হারূন (আ.) নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হন এবং মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সত্যের দাওয়াতের মহান দায়িত্বে অংশগ্রহণ করেন।

দুই ভাই একসঙ্গে ফিরআউনের দরবারে গিয়ে তাওহীদের আহ্বান জানালেন। আল্লাহ তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন,

"তোমরা উভয়ে ফিরআউনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে। তারপর তার সঙ্গে কোমল ভাষায় কথা বলো; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"

— সূরা ত্বা-হা, ২০:৪৩–৪৪

এটি ছিল দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। পৃথিবীর সবচেয়ে জালিম শাসকের কাছেও আল্লাহ প্রথমে কোমল ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হারূন (আ.) তাঁর ভাইয়ের পাশে থেকে সব কঠিন মুহূর্তে সহযোগিতা করেছেন। ফিরআউনের বিরোধিতা, বনি ইসরাঈলকে মুক্ত করার সংগ্রাম এবং আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে তিনি কখনো পিছিয়ে যাননি।

এরপর আল্লাহ মূসা (আ.)-কে চল্লিশ রাতের জন্য তূর পর্বতে ডাকলেন। যাওয়ার আগে মূসা (আ.) তাঁর ভাইকে বললেন,

"আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হও, সংশোধনের কাজ করো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না।"

> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪২

মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে সামিরী বনি ইসরাঈলকে বিভ্রান্ত করে বাছুর পূজায় লিপ্ত করল।

হারূন (আ.) তাদের সতর্ক করে বললেন,

> "হে আমার জাতি! তোমরা তো এর মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়েছ। তোমাদের প্রতিপালক তো একমাত্র পরম করুণাময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার নির্দেশ মেনে চলো।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯০

কিন্তু তারা তাঁর কথা মানল না। বরং বলল,

> "মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা করতেই থাকব।"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯১

মূসা (আ.) ফিরে এসে প্রথমে বিষয়টি না বুঝে হারূন (আ.)-কে কঠোরভাবে প্রশ্ন করলেন।

তখন হারূন (আ.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন,

> "হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরবেন না। আমি আশঙ্কা করেছিলাম, আপনি বলবেন—'তুমি বনি ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ।'"
>
> — সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৪

এতে বোঝা যায়, হারূন (আ.) দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেননি; বরং ফিতনা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

কুরআনে আল্লাহ হারূন (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদার কথাও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন,

> "আমার রহমতে আমি তাকে তাঁর ভাই হারূনকে নবী হিসেবে দান করেছিলাম।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৫৩

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "আমি মূসা ও হারূনকে ফুরকান, আলো এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ প্রদান করেছিলাম।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৪৮

হারূন (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, আল্লাহর দ্বীনের কাজ একা করার বিষয় নয়। পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততা দাওয়াতের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে।

তিনি আরও শেখান, মানুষের অবাধ্যতায় হতাশ না হয়ে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সত্যের দাওয়াত চালিয়ে যেতে হয়। সব মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সত্য গ্রহণ করবে না, কিন্তু একজন নবীর দায়িত্ব ছিল সত্য পৌঁছে দেওয়া—আর হারূন (আ.) সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন।

হারূন (আ.) ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ভাই, একজন ধৈর্যশীল নেতা এবং আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়, সত্যের পথে একজন আন্তরিক সহচর আল্লাহর বড় নিয়ামত।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
যুলকিফল (আ.): ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও অঙ্গীকার রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পঞ্চম অংশ

বনি ইসরাঈলের পরবর্তী নবীগণ

যুলকিফল থেকে ঈসা (আ.) পর্যন্ত

পর্ব ২১ – ২৯

প র্ব

২১

যুলকিফল (আ.)

ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও অঙ্গীকার রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

কুরআনে এমন কয়েকজন নবীর কথা এসেছে, যাঁদের সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের একজন হলেন যুলকিফল (আ.)। যদিও তাঁর জীবনের বিস্তারিত ঘটনা কুরআন বা সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়নি, তবুও আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন। একজন মুমিনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট সম্মানের বিষয়।

আল্লাহ বলেন,

> "আর স্মরণ করুন ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৫

এরপর আল্লাহ বলেন,

> "আমি তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৬

অন্য একটি স্থানে আল্লাহ আবারও তাঁর নাম উল্লেখ করে বলেন,

> "আর স্মরণ করুন আমার বান্দাদের—ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, যুলকিফল—তারা সবাই ছিল উত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:৪৫–৪৮

কুরআন যুলকিফল (আ.)-এর কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করেনি। সহিহ হাদিসেও তাঁর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাই তাঁর জীবন নিয়ে প্রচলিত অনেক কাহিনি, যেমন—তিনি অমুক রাজার বিচারক ছিলেন বা অমুক ঘটনা ঘটেছিল—এসবের নির্ভরযোগ্য দলিল নেই। একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত, যে বিষয়ের প্রমাণ নেই তা নবীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করা।

তবে কুরআনের আয়াতগুলো থেকেই তাঁর চরিত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, তিনি ছিলেন অসাধারণ ধৈর্যশীল। আল্লাহ তাঁকে ধৈর্যশীলদের কাতারে স্থান দিয়েছেন। একজন নবীর জীবনে ধৈর্য মানে শুধু কষ্ট সহ্য করা নয়; বরং মানুষের বিরোধিতা, দাওয়াতের কঠিন পথ এবং আল্লাহর আদেশের ওপর অবিচল থাকা।

দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ নিজেই তাঁর এই মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন। একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কী হতে পারে?

তৃতীয়ত, তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশেষ রহমতের অধিকারী। এটি প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

যুলকিফল (আ.)-এর জীবনের বিস্তারিত ঘটনা আমাদের জানা না থাকলেও তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় প্রচার বা খ্যাতি দিয়ে নয়; বরং ঈমান, ধৈর্য, তাকওয়া ও সৎকর্মের মাধ্যমে।

পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের কাজ মানুষের চোখে খুব বেশি আলোচিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ তাঁদের ভালোবাসেন এবং তাঁদের নাম সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করেন। যুলকিফল (আ.) তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

তাঁর জীবন আমাদের আরও শেখায়, কুরআন ও সহিহ হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেটুকুই গ্রহণ করব। প্রমাণহীন কাহিনি দিয়ে নবীদের জীবন অলংকৃত করার প্রয়োজন নেই। নবীদের মর্যাদা আল্লাহ নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আল্লাহ যুলকিফল (আ.)-কে ধৈর্যশীল, সৎকর্মশীল এবং তাঁর রহমতপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই একজন মুমিনেরও চেষ্টা হওয়া উচিত—ধৈর্য, আমানতদারিতা, আল্লাহর আনুগত্য এবং সৎকর্মের মাধ্যমে সেই সৌভাগ্য অর্জন করা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
দাউদ (আ.): একজন নবী, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং আল্লাহর প্রশংসায় নিবেদিত এক বান্দা।

প র্ব

২২

দাউদ (আ.)

একজন নবী, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং আল্লাহর প্রশংসায় নিবেদিত এক বান্দা

বনি ইসরাঈলের ইতিহাসে এমন এক সময় এল, যখন তারা চারদিক থেকে শত্রুদের আক্রমণের শিকার হচ্ছিল। আল্লাহ তাদের জন্য তালূতকে (শাউল) শাসক হিসেবে মনোনীত করলেন। কিন্তু অনেকেই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে চাইল না। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করলেন, আর সেই পরীক্ষায় অল্প কয়েকজনই সফল হলো। (সূরা আল-বাকারা, ২:২৪৬–২৪৯)

সে সময় শত্রুপক্ষের সেনাপতি ছিল শক্তিশালী ও ভয়ংকর জালূত (গোলিয়াথ)।

যুদ্ধের দিন অধিকাংশ মানুষ ভীত হয়ে পড়লেও ঈমানদাররা বলল,

> "কত ছোট দলই না আল্লাহর অনুমতিতে বড় দলকে পরাজিত করেছে! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২৪৯

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তারা দোয়া করল,

> "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর ধৈর্য বর্ষণ করুন, আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় রাখুন এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২৫০

আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করলেন।

কুরআন বলে,

> "অতঃপর তারা আল্লাহর অনুমতিতে তাদের পরাজিত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন। আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তিনি তাঁকে যা ইচ্ছা শিক্ষা দিলেন।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২৫১

এভাবেই দাউদ (আ.)-এর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। আল্লাহ তাঁকে শুধু নবুওয়াতই দেননি; তাঁকে রাজত্ব, প্রজ্ঞা এবং ন্যায়বিচারের দায়িত্বও দান করেছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) করেছি। অতএব, মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করুন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না; তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:২৬

দাউদ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুজার। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহে এত বেশি মগ্ন থাকতেন যে, আল্লাহ পাহাড় ও পাখিদেরও তাঁর সঙ্গে তাসবীহ পাঠ করার বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি পাহাড়সমূহকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলাম। তারা সন্ধ্যা ও সকালে তাঁর সঙ্গে তাসবীহ পাঠ করত। আর সমবেত পাখিদেরও (অধীন করেছিলাম)। প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:১৮–১৯

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "হে পাহাড়সমূহ! তোমরা তাঁর সঙ্গে তাসবীহ পাঠ করো। আর হে পাখিরাও!"

— সূরা সাবা, ৩৪:১০

আল্লাহ দাউদ (আ.)-কে যাবূর (যবুর) কিতাব দান করেছিলেন।

> "আমি দাউদকে যাবূর প্রদান করেছি।"
>
> — সূরা আন-নিসা, ৪:১৬৩; সূরা আল-ইসরা, ১৭:৫৫

তাঁর আরেকটি বিশেষ মুজিযা ছিল—লোহা তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।"
>
> — সূরা সাবা, ৩৪:১০

এরপর তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল,

> "প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো এবং কড়াগুলো সঠিকভাবে সংযুক্ত করো।"
>
> — সূরা সাবা, ৩৪:১১

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে মানুষের উপকারে প্রযুক্তি ও দক্ষতা ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

একদিন দুই ব্যক্তি একটি বিবাদ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। একজনের অভিযোগ ছিল, অন্যজন তার প্রতি অন্যায় করেছে। দাউদ (আ.) প্রথমে এক পক্ষের কথা শুনেই সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন, এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য একটি পরীক্ষা।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

> "তখন দাউদ বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি। তাই তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এলেন।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:২৪

আল্লাহ তাঁর এ তাওবা কবুল করলেন।

> "অতঃপর আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয়ই আমার কাছে তাঁর জন্য রয়েছে নৈকট্য এবং উত্তম প্রত্যাবর্তনের স্থান।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:২৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাউদ (আ.)-এর ইবাদতের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন,

> "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সালাত ছিল দাউদ (আ.)-এর সালাত, আর সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম ছিল দাউদ (আ.)-এর সিয়াম। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ রাত নামাজ পড়তেন এবং এক-ষষ্ঠাংশ রাত আবার বিশ্রাম নিতেন। আর তিনি একদিন সাওম রাখতেন এবং একদিন সাওম রাখতেন না।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১১৩১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১৫৯

দাউদ (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, প্রকৃত নেতৃত্ব ক্ষমতার অহংকারে নয়; ন্যায়বিচার, বিনয় এবং আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন একজন রাজা, কিন্তু কখনো আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি ভুল বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করতেন এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসতেন।

একজন মুমিনের জন্য দাউদ (আ.)-এর জীবন একটি অনন্য আদর্শ—ইবাদত, ন্যায়বিচার, তাওবা এবং আল্লাহর প্রশংসায় নিবেদিত থাকার আদর্শ।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
সুলাইমান (আ.): আল্লাহপ্রদত্ত রাজত্ব, জিন, পাখি ও প্রাণীদের ভাষা এবং শাসনের বিস্ময়কর নিদর্শন।

প র্ব

২৩

সুলাইমান (আ.)

আল্লাহপ্রদত্ত রাজত্ব, জিন, পাখি ও প্রাণীদের ভাষা এবং শাসনের বিস্ময়কর নিদর্শন

দাউদ (আ.)-এর ইন্তিকালের পর আল্লাহ তাঁর পুত্র সুলাইমান (আ.)-কে নবুওয়াত ও রাজত্ব দান করলেন। তিনি ছিলেন এমন একজন নবী, যাঁকে আল্লাহ এমন কিছু বিশেষ নিয়ামত দিয়েছিলেন, যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।

আল্লাহ বলেন,

> "সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন। তিনি বললেন, 'হে মানুষ! আমাদের পাখিদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের সবকিছু থেকে দান করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।'"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:১৬

আল্লাহ তাঁর অধীনে মানুষ, জিন এবং পাখিদের সমবেত করেছিলেন।

> "সুলাইমানের জন্য তাঁর সৈন্যবাহিনী—জিন, মানুষ ও পাখিদের সমবেত করা হলো এবং তাদের সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হলো।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:১৭

একদিন এই বিশাল বাহিনী নিয়ে চলার সময় তারা একটি পিঁপড়ার উপত্যকায় পৌঁছাল।

একটি পিঁপড়া অন্য পিঁপড়াদের বলল,

> "হে পিঁপড়ারা! তোমরা নিজেদের বাসায় প্রবেশ করো, যেন সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী অজান্তেই তোমাদের পিষে না ফেলে।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:১৮

সুলাইমান (আ.) পিঁপড়ার কথা বুঝতে পারলেন এবং মুচকি হেসে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য যেন আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমাকে সে তাওফিক দিন। আর এমন সৎকাজ করার তাওফিক দিন, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আপনার রহমতে আমাকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:১৯

এই দোয়া একজন মুমিনের জন্য কৃতজ্ঞতার এক অসাধারণ শিক্ষা।

একদিন তিনি তাঁর বাহিনীর পাখিদের পরিদর্শন করছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, হুদহুদ পাখিটি অনুপস্থিত।

তিনি বললেন,

> "আমার কী হলো যে, আমি হুদহুদকে দেখছি না? সে কি অনুপস্থিত? যদি সে গ্রহণযোগ্য কারণ না দেখায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব অথবা জবাই করব।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:২০–২১

কিছুক্ষণ পর হুদহুদ ফিরে এসে বলল,

> "আমি এমন একটি বিষয় জেনেছি, যা আপনি জানেন না। আমি সাবা দেশ থেকে আপনার কাছে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:২২

হুদহুদ জানাল, সেখানে একজন রানি রাজত্ব করেন। আল্লাহ তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং তাঁর একটি মহাসিংহাসন রয়েছে। কিন্তু তিনি ও তাঁর জাতি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের উপাসনা করে।

> "আমি দেখেছি, সে এবং তার জাতি আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:২৪

সুলাইমান (আ.) তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলেন না। তিনি প্রথমে সংবাদটি যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি হুদহুদের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন,

> "আমার এই পত্রটি নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে পৌঁছে দাও। তারপর তাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়াও এবং দেখো, তারা কী জবাব দেয়।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:২৮

চিঠিতে লেখা ছিল,

> "এটি সুলাইমানের পক্ষ থেকে। শুরু করছি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। আমার বিরুদ্ধে অহংকার করো না এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে চলে এসো।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:৩০–৩১

সাবার রানি বিলকিস তাঁর সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সুলাইমান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রানি আসার আগেই সুলাইমান (আ.) বললেন,

> "তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসনটি আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে ?"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:৩৮

এক শক্তিশালী জিন বলল, সে তা নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু এমন একজন ব্যক্তি, যার কাছে আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল, বললেন,

> "আপনার চোখের পলক পড়ার আগেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেব।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:৪০

মুহূর্তের মধ্যেই সিংহাসন উপস্থিত হলো।

এ দৃশ্য দেখে সুলাইমান (আ.) অহংকার করেননি। বরং বললেন,

> "এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন—আমি কৃতজ্ঞ হই, নাকি অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে নিজেরই কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, তবে আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত ও মহামহিমান্বিত।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:৪০

অবশেষে রানি বিলকিস সুলাইমান (আ.)-এর সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি আল্লাহর দেওয়া নিদর্শনগুলো দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন, এটি কোনো সাধারণ রাজত্ব নয়; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত নবুওয়াতের নিদর্শন।

তখন তিনি ঘোষণা করলেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আর আমি সুলাইমানের সঙ্গে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।"
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:৪৪

আল্লাহ সুলাইমান (আ.)-কে বাতাসের ওপরও বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

> "আর সুলাইমানের জন্য বায়ুকে (অনুগত করেছিলাম), যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করত।"
>
> — সূরা সাবা, ৩৪:১২; সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮১

এছাড়া জিনদের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন নির্মাণকাজ করাতেন।

> "তারা তাঁর জন্য দুর্গ, ভাস্কর্য, বড় বড় পাত্র ও স্থির চুল্লি তৈরি করত।"
>
> — সূরা সাবা, ৩৪:১৩

তবে এখানে উল্লেখ্য, এগুলো ছিল সুলাইমান (আ.)-এর শরিয়তে বৈধ। ইসলামের শরিয়তে প্রাণীর বা মানুষের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নির্মাণ বৈধ নয়—এ বিষয়ে সহিহ হাদিসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

অবশেষে সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর সময়ও আল্লাহ একটি শিক্ষা দিলেন।

তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জিনরা মনে করছিল, তিনি এখনো জীবিত এবং কাজ করে যাচ্ছিল। পরে একটি উইপোকা তাঁর লাঠি খেয়ে ফেললে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন জিনরা বুঝতে পারল, তিনি আগেই ইন্তিকাল করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

> "যখন আমি তাঁর মৃত্যুর ফয়সালা করলাম, তখন একটি উইপোকা তাঁর লাঠি খেতে লাগল। তিনি পড়ে গেলে জিনরা বুঝতে পারল, যদি তারা গায়েব জানত, তবে তারা এই অপমানজনক শ্রমে পড়ে থাকত না।"
>
> — সূরা সাবা, ৩৪:১৪

সুলাইমান (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, জ্ঞান, শক্তি, রাজত্ব ও ক্ষমতা—সবই আল্লাহর দান। এগুলো নিয়ে অহংকার করার নয়; বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার।

তাঁর জীবন আরও শেখায়, একজন প্রকৃত নেতা শক্তির মাধ্যমে নয়, ন্যায়, প্রজ্ঞা, বিনয় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করেন। আর গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই; কোনো জিন, মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টি তা স্বাধীনভাবে জানে না।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ইলিয়াস (আ.): শিরক ও বাল-উপাসনার বিরুদ্ধে তাওহীদের অবিচল আহ্বান।

প র্ব

২৪

ইলিয়াস (আ.)

শিরক ও বাল-উপাসনার বিরুদ্ধে তাওহীদের অবিচল আহ্বান

বনি ইসরাঈলের ইতিহাসে এমন এক সময় এসেছিল, যখন তারা আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত পাওয়ার পরও তাওহীদের পথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করেছিল। তারা বিভিন্ন মূর্তি ও দেবদেবীর উপাসনায় জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে 'বা'ল' (بَعْل) নামে একটি মূর্তির পূজা তাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়।

এই সময় মহান আল্লাহ তাদের হিদায়াতের জন্য তাঁর সম্মানিত নবী ইলিয়াস (আ.)-কে প্রেরণ করেন।

আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই ইলিয়াসও ছিলেন রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৩

ইলিয়াস (আ.) তাঁর জাতিকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানালেন। তিনি প্রশ্ন করলেন,

> "তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? তোমরা কি 'বা'ল'-কে ডাকছ, আর সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করছ? যিনি আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৪–১২৬

এটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি প্রশ্ন। মানুষ নিজের হাতে তৈরি বা অন্যের বানানো মূর্তির কাছে কীভাবে সাহায্য চায়, অথচ আসমান-জমিনের স্রষ্টাকে ভুলে যায়?

ইলিয়াস (আ.) তাদের বুঝিয়ে দিলেন, প্রকৃত উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। রিযিক, জীবন, মৃত্যু, উপকার ও অপকার—সবকিছুর মালিক তিনিই। পাথর, কাঠ বা ধাতুর তৈরি কোনো মূর্তি মানুষের কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল।

আল্লাহ বলেন,

> "কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা অবশ্যই (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৭

তবে সবাই অবাধ্য ছিল না।

কিছু মানুষ আন্তরিকভাবে আল্লাহর ওপর ঈমান আনল এবং ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াত গ্রহণ করল।

আল্লাহ বলেন,

> "তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা (এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না)।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৮

আল্লাহ ইলিয়াস (আ.)-এর প্রশংসা করে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য সম্মানের ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি বলেন,

> "আমি পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর জন্য সুনাম রেখে দিয়েছি। ইলিয়াসের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তিনি আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।"

— সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৯–১৩২

কুরআনে ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত হয়নি। সহিহ হাদিসেও তাঁর দাওয়াতের অতিরিক্ত নির্ভরযোগ্য বিবরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না। তাই তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত অনেক কাহিনি—যেমন দীর্ঘ খরা, নির্দিষ্ট রাজা বা অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ—যদি কুরআন বা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তবে সেগুলোকে নিশ্চিত ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা উচিত নয়।

ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, শিরক মানবজাতির সবচেয়ে বড় অন্যায়। মানুষ যখন স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে, তখন সে নিজের মর্যাদাকেই ক্ষুন্ন করে। একজন নবীর প্রথম ও প্রধান দাওয়াত ছিল—"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।"

তাঁর জীবন আরও শেখায়, সত্যের দাওয়াত দিতে গিয়ে মানুষের বিরোধিতা আসবেই। কিন্তু একজন মুমিনের কাজ হলো ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া। হিদায়াত দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

আজও পৃথিবীতে শিরকের রূপ বদলেছে, কিন্তু শিরক শেষ হয়ে যায়নি। তাই ইলিয়াস (আ.)-এর আহ্বান আজও সমান প্রাসঙ্গিক—সব ধরনের শিরক, কুসংস্কার ও মিথ্যা উপাসনা পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
আল-ইয়াসা (আ.): ইলিয়াস (আ.)-এর পর তাওহীদের ধারাবাহিক দাওয়াতের একজন সম্মানিত নবী।

পর্ব

২৫

আল-ইয়াসা (আ.)

তাওহীদের দাওয়াতের ধারাবাহিকতায় একজন সম্মানিত নবী

আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। একজন নবীর ইন্তিকালের পর যখন মানুষ আবার পথভ্রষ্ট হতে শুরু করত, তখন আল্লাহ তাদের মধ্য থেকেই আরেকজন নবীকে প্রেরণ করতেন, যাতে তাওহীদের আলো নিভে না যায়।

ইলিয়াস (আ.)-এর পর বনি ইসরাঈলের কাছে আল্লাহ প্রেরণ করেন তাঁর সম্মানিত নবী আল-ইয়াসা (আ.)-কে। যদিও কুরআন তাঁর জীবনের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেনি, তবুও আল্লাহ তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

> "আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (স্মরণ করুন)। আমি তাদের প্রত্যেককে বিশ্ববাসীর ওপর মর্যাদা দান করেছিলাম।"
>
> — সূরা আল-আন'আম, ৬:৮৬

অন্য একটি স্থানে আল্লাহ বলেন,

> "আর স্মরণ করুন আমার বান্দাদের—ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, যুলকিফল—তারা সবাই ছিল উত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।"
>
> — সূরা সাদ, ৩৮:৪৫–৪৮

এই আয়াতগুলো থেকেই বোঝা যায়, আল-ইয়াসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত, নেককার ও সম্মানিত নবীদের একজন।

কুরআনে তাঁর দাওয়াতের বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও নবীদের সাধারণ দায়িত্ব ছিল এক ও অভিন্ন—মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা, শিরক থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার শিক্ষা দেওয়া।

আল-ইয়াসা (আ.)-ও তাঁর জাতিকে সেই একই আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, দুনিয়ার সফলতা ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃত সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের মুক্তি লাভ।

কুরআন তাঁর কোনো নির্দিষ্ট মুজিযা, ভ্রমণ বা বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করেনি। সহিহ হাদিসেও তাঁর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাই তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনি বা ইসরাঈলিয়াতকে নিশ্চিত ইতিহাস হিসেবে বর্ণনা করা সঠিক নয়।

এটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। নবীদের সম্পর্কে আমরা কেবল সেই তথ্যই নিশ্চিতভাবে বলব, যা কুরআন বা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কারণ নবীদের জীবন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অনুমান বা কল্পনার ওপর নয়।

আল-ইয়াসা (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের আরও একটি বিষয় শেখায়—মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত না হলেও আল্লাহর কাছে একজন বান্দার মর্যাদা অনেক উচ্চ হতে পারে। পৃথিবীর খ্যাতি নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রকৃত সফলতার মাপকাঠি।

আজকের যুগেও একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো নবীদের দেখানো পথ অনুসরণ করা—তাওহীদকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, আল্লাহর বিধান মেনে চলা, মানুষের কল্যাণ কামনা করা এবং সত্যকে সুন্দরভাবে পৌঁছে দেওয়া।

আল-ইয়াসা (আ.)-এর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নবীদের ধারাবাহিক দাওয়াত ছিল একটিই—একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং তাঁর নির্দেশ মেনে জীবন পরিচালনা করো।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ইউনুস (আ.): ধৈর্য, তাওবা এবং আল্লাহর অসীম রহমতের এক অনন্য শিক্ষা।

পর্ব

২৬

ইউনুস (আ.)

ধৈর্য, তাওবা এবং আল্লাহর অসীম রহমতের এক অনন্য শিক্ষা

আল্লাহ যুগে যুগে মানুষকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের কেউ অল্প সময়ে মানুষের সাড়া পেয়েছেন, আবার কেউ বছরের পর বছর দাওয়াত দিয়েও অবাধ্যতার সম্মুখীন হয়েছেন। এমনই একজন মহান নবী ছিলেন ইউনুস (আ.)।

আল্লাহ তাঁকে নিনওয়া অঞ্চলের একটি জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে তাদের এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানালেন এবং শিরক ও পাপ থেকে ফিরে আসতে বললেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁর কথা গ্রহণ করল না।

দীর্ঘ সময় দাওয়াত দেওয়ার পরও যখন তারা অবাধ্যতায় অটল রইল, তখন ইউনুস (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত অনুমতি আসার আগেই নিজের জাতিকে ছেড়ে চলে গেলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "মাছওয়ালার (ইউনুসের) কথা স্মরণ করুন। যখন তিনি ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে সংকীর্ণ অবস্থায় ফেলব না।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৭

তিনি একটি জাহাজে আরোহণ করলেন। সমুদ্রের মাঝখানে প্রবল ঝড় শুরু হলো। জাহাজ হালকা করার জন্য লটারির ব্যবস্থা করা হলো, আর বারবার ইউনুস (আ.)-এর নামই উঠে এলো।

আল্লাহ বলেন,

> "তিনি একটি বোঝাই নৌকায় পালিয়ে গেলেন। অতঃপর লটারিতে অংশগ্রহণ করলেন এবং পরাজিতদের অন্তর্ভুক্ত হলেন।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৪০–১৪১

অবশেষে তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো।

ঠিক তখনই আল্লাহর নির্দেশে একটি বিশাল মাছ তাঁকে গিলে ফেলল।

> "অতঃপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, আর তখন তিনি নিজেকেই তিরস্কার করছিলেন।"
>
> — সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৪২

মাছের পেটের অন্ধকারে—সমুদ্রের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার এবং মাছের পেটের অন্ধকার—ইউনুস (আ.) উপলব্ধি করলেন, একমাত্র আল্লাহই তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন।

তিনি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন,

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

"আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আপনি মহাপবিত্র। নিশ্চয়ই আমি নিজের প্রতি জুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৭)

এটি কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাওবার দোয়া।

আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

> "অতঃপর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি।"

— সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৮

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

"যদি তিনি আল্লাহর তাসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন, তবে মানুষ পুনরুত্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতেন।"

— সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৪৩–১৪৪

এরপর আল্লাহ তাঁকে উপকূলে নিক্ষেপ করলেন। তখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন।

"আমি তাঁকে এক নির্জন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আর আমি তাঁর ওপর লাউজাতীয় একটি গাছ জন্মিয়ে দিলাম।"

— সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৪৫–১৪৬

আল্লাহ তাঁর শারীরিক শক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং আবারও তাঁকে তাঁর জাতির কাছে পাঠালেন।

এদিকে ইউনুস (আ.)-এর জাতি আল্লাহর শাস্তির লক্ষণ দেখে আন্তরিকভাবে তাওবা করেছিল।

আল্লাহ বলেন,

"ইউনুসের জাতি ছাড়া এমন কোনো জনপদ ছিল না, যারা ঈমান এনে উপকৃত হয়েছে। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাকর শাস্তি দূর করে দিলাম এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের ভোগ করার সুযোগ দিলাম।"

— সূরা ইউনুস, ১০:৯৮

এটি কুরআনে একটি বিরল ঘটনা। অধিকাংশ অবাধ্য জাতি নবীদের অস্বীকার করে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু ইউনুস (আ.)-এর জাতি সময়মতো তাওবা করায় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ইউনুস (আ.)-এর দোয়ার বিশেষ ফজিলতের কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

> "যে কোনো মুসলিম এই দোয়া করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন।"
>
> — জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৫০৫ ; হাদিসটি সহিহ

ইউনুস (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, দাওয়াতের পথে ধৈর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কখনো হতাশ হয়ে আল্লাহর নির্দেশের আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

তাঁর জীবন আরও শেখায়, মানুষ যত বড় ভুলই করুক না কেন, যদি সে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। মাছের পেটের অন্ধকার থেকেও যিনি তাঁর নবীকে উদ্ধার করেছেন, তিনি আজও তাঁর বান্দাদের দোয়া শুনেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি দেন।

আর ইউনুস (আ.)-এর জাতির ঘটনা আমাদের আশা জাগায়—একটি সমাজও যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তাঁর রহমতের দরজা খুলে দেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
যাকারিয়া (আ.): বার্ধক্যে সন্তানের জন্য দোয়া এবং আল্লাহর অলৌকিক অনুগ্রহ।

পর্ব

২৭

যাকারিয়া (আ.)

বার্ধক্যে সন্তানের জন্য দোয়া এবং আল্লাহর অলৌকিক অনুগ্রহ

আল্লাহর নেক বান্দারা কখনো তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হন না। দুনিয়ার সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁরা জানেন, আল্লাহর দরজা কখনো বন্ধ হয় না। এই বিশ্বাসের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন মহান নবী যাকারিয়া (আ.)।

তিনি ছিলেন বনি ইসরাঈলের একজন সম্মানিত নবী। দীর্ঘ জীবন আল্লাহর দীন প্রচারে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের একটি বড় কষ্ট ছিল—তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। বার্ধক্য এসে গেছে, চুল সাদা হয়ে গেছে, স্ত্রীও ছিলেন সন্তান জন্মদানে অক্ষম। মানবীয় দৃষ্টিতে সন্তান লাভের আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

তবুও তিনি আশা হারাননি।

যাকারিয়া (আ.) বিশেষভাবে মারইয়াম (আ.)-এর দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি যখনই মারইয়াম (আ.)-এর ইবাদতের কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত রিযিক দেখতে পেতেন।

আল্লাহ বলেন,

> "যখনই যাকারিয়া তাঁর কাছে মিহরাবে প্রবেশ করতেন, তখনই তাঁর কাছে রিযিক দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, 'হে মারইয়াম! এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো?' তিনি বলতেন, 'এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, হিসাব ছাড়াই রিযিক দান করেন।'"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৭

এই দৃশ্য যাকারিয়া (আ.)-এর অন্তরে নতুন আশা জাগিয়ে তুলল। যিনি মৌসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি তো বার্ধক্যেও সন্তান দান করতে সক্ষম।

সেখানেই তিনি বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৮

অন্যত্র কুরআনে তাঁর হৃদয়স্পর্শী দোয়া আরও বিস্তারিতভাবে এসেছে।

তিনি বললেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে, মাথা পাকা চুলে ভরে গেছে। কিন্তু হে আমার প্রতিপালক! আপনার কাছে দোয়া করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি। আমি আমার পরবর্তী আত্মীয়দের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব, আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এমন একজন উত্তরাধিকারী দান করুন, যে আমার এবং ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে আপনার প্রিয় বান্দা বানিয়ে দিন।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৪–৬

আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

ফেরেশতারা তাঁকে সুসংবাদ দিলেন,

> "হে যাকারিয়া! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া নামে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, অত্যন্ত পবিত্র এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী হবেন।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৯

যাকারিয়া (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! আমার তো বার্ধক্য এসে গেছে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাহলে আমার সন্তান কীভাবে হবে?"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৪০

আল্লাহ জবাব দিলেন,

> "এভাবেই হবে। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৪০

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "সে (ফেরেশতা) বলল, 'এভাবেই'। তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজ। আমি তো ইতঃপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, তখন তুমি কিছুই ছিলে না'।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৯

যাকারিয়া (আ.) একটি নিদর্শন প্রার্থনা করলেন।

আল্লাহ বললেন,

> "আপনার নিদর্শন হলো—আপনি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন দিন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না, তবে ইশারায় কথা বলবেন। আর আপনি আপনার প্রতিপালককে বেশি বেশি স্মরণ করবেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবেন।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৪১; সূরা মারইয়াম, ১৯:১০

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, যাকারিয়া (আ.)-এর ঘরে ইয়াহইয়া (আ.) জন্মগ্রহণ করলেন—যিনি পরবর্তীতে আল্লাহর একজন মহান নবী হন।

যাকারিয়া (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। মানুষের কাছে যা অসম্ভব মনে হয়, আল্লাহর কাছে তা অত্যন্ত সহজ।

তাঁর দোয়া আরও শেখায়, একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় চাওয়া হওয়া উচিত নেক সন্তান, যে আল্লাহর দীনকে ধারণ করবে এবং সমাজে কল্যাণের উৎস হবে।

মারইয়াম (আ.)-এর রিযিক দেখে যাকারিয়া (আ.)-এর অন্তরে যে আশা জেগেছিল, তা আমাদেরও শিক্ষা দেয়—আল্লাহর নিয়ামত দেখে ঈমান আরও দৃঢ় হয় এবং দোয়ার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

ইয়াহইয়া (আ.): পবিত্র চরিত্র, প্রজ্ঞা ও আল্লাহভীতির এক উজ্জ্বল আদর্শ।

প র্ব

২৮

ইয়াহইয়া (আ.)

পবিত্র চরিত্র, প্রজ্ঞা ও আল্লাহভীতির এক উজ্জ্বল আদর্শ

আল্লাহ যখন যাকারিয়া (আ.)-এর বার্ধক্যে তাঁর দোয়া কবুল করলেন, তখন শুধু একটি সন্তানই দান করেননি; বরং এমন একজন নবী দান করেছিলেন, যিনি শৈশব থেকেই জ্ঞান, পবিত্রতা ও তাকওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন ইয়াহইয়া (আ.)।

তাঁর জন্মই ছিল আল্লাহর এক বিশেষ নিদর্শন। এমন এক বৃদ্ধ পিতা এবং বন্ধ্যা মাতার ঘরে তাঁর জন্ম হয়, যেখানে মানবীয় দৃষ্টিতে সন্তানের আশা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর জন্য অসম্ভব বলে কিছু নেই।

ফেরেশতারা যাকারিয়া (আ.)-কে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন,

> "হে যাকারিয়া! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া নামে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর এই নাম আমি পূর্বে আর কাউকে দিইনি।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৭

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "তিনি আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, অত্যন্ত পবিত্র এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী হবেন।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৯

শৈশব থেকেই ইয়াহইয়া (আ.) ছিলেন অসাধারণ।

আল্লাহ বলেন,

> "হে ইয়াহইয়া! তুমি এই কিতাব দৃঢ়ভাবে ধারণ করো।" আর আমি তাঁকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম।
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:১২

এটি ছিল আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। সাধারণত মানুষ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপক্ব হয়। কিন্তু ইয়াহইয়া (আ.)-কে আল্লাহ ছোটবেলাতেই হিকমত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা দান করেছিলেন।

এরপর আল্লাহ তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন,

> "আর আমার পক্ষ থেকে তাঁকে কোমল হৃদয়, পবিত্রতা দান করেছিলাম এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকি।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:১৩

আল্লাহ আরও বলেন,

> "তিনি তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচারী ছিলেন। তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:১৪

কুরআনের এই কয়েকটি আয়াতেই ইয়াহইয়া (আ.)-এর চরিত্রের এক অপূর্ব চিত্র ফুটে ওঠে।

তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু, বিনয়ী, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং পিতা-মাতার প্রতি অত্যন্ত অনুগত।

আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে আরও বলেন,

> "আর তার উপর শান্তি, যেদিন সে জন্মেছে এবং যেদিন সে মারা যাবে আর যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:১৫

এটি কুরআনে ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্য আল্লাহর এক বিশেষ সম্মান।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم ইয়াহইয়া (আ.)-এর মর্যাদা সম্পর্কেও ইঙ্গিত করেছেন। মিরাজের রাতে তিনি দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৪)

কুরআন ইয়াহইয়া (আ.)-এর শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করেনি। পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তবে সেগুলোর অধিকাংশই কুরআন বা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই সেগুলোকে নিশ্চিত ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা উচিত নয়।

ইয়াহইয়া (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, প্রকৃত মর্যাদা বয়সে নয়; আল্লাহর আনুগত্যে। একজন কিশোরও আল্লাহর নিকট এমন মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা অনেক বয়স্ক মানুষ অর্জন করতে পারে না।

তাঁর জীবন আরও শেখায়, পবিত্র চরিত্র, তাকওয়া, জ্ঞান এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচার—এসব একজন মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ।

আজকের তরুণদের জন্য ইয়াহইয়া (আ.) এক উজ্জ্বল আদর্শ। চারপাশে ফিতনা, গুনাহ ও নৈতিক অবক্ষয়ের মাঝেও একজন যুবক আল্লাহভীরু, চরিত্রবান এবং সত্যনিষ্ঠ হতে পারে—ইয়াহইয়া (আ.) তার জীবন্ত প্রমাণ।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ঈসা (আ.): অলৌকিক জন্ম, মহান মুজিযা এবং এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান।

পর্ব

২৯

ঈসা (আ.)

অলৌকিক জন্ম, মহান মুজিযা এবং এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান

মানবজাতির ইতিহাসে আল্লাহ কিছু ঘটনাকে বিশেষ নিদর্শন হিসেবে রেখেছেন, যাতে মানুষ তাঁর অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে। ঈসা (আ.)-এর জন্ম ছিল তেমনই এক মহান নিদর্শন। তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এতে তাঁর কোনো ঐশ্বরিক মর্যাদা প্রমাণিত হয় না; বরং এটি আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রমাণ।

যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন মারইয়াম (আ.)। তিনি ছিলেন পবিত্রতা, ইবাদত ও তাকওয়ার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

একদিন ফেরেশতারা তাঁকে সুসংবাদ দিলেন,

> "হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর নাম হবে মসীহ, মারইয়ামের পুত্র ঈসা। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হবেন এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৫

মারইয়াম (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন,

> "হে আমার প্রতিপালক! কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি, তাহলে আমার সন্তান কীভাবে হবে?"

আল্লাহ বললেন,

> "এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।"

— সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৭

অন্যত্র আল্লাহ জানান, ফেরেশতা জিবরীল (আ.) আল্লাহর নির্দেশে মারইয়াম (আ.)-এর কাছে এসে তাঁকে এক পবিত্র পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দেন। অতঃপর আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছায় মারইয়াম (আ.) অলৌকিকভাবে গর্ভধারণ করেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯:১৬–২২)

প্রসবের সময় মারইয়াম (আ.) একা ছিলেন। কষ্টে তিনি একটি খেজুরগাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। তখন আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁর জন্য ঝরনার ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে বলা হলো,

"খেজুরগাছের কাণ্ড তোমার দিকে নাড়াও, তাহলে তোমার ওপর তাজা খেজুর ঝরে পড়বে। খাও, পান করো এবং চোখ জুড়াও।"

— সূরা মারইয়াম, ১৯:২৪–২৬

মারইয়াম (আ.) নবজাতক সন্তানকে নিয়ে যখন তাঁর জাতির কাছে ফিরলেন, তারা তাঁকে অপবাদ দিতে শুরু করল।

তখন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি কোনো কথা বললেন না; বরং শিশুর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

মানুষ বিস্মিত হয়ে বলল,

"কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কীভাবে কথা বলব?"

— সূরা মারইয়াম, ১৯:২৯

ঠিক তখনই আল্লাহর ইচ্ছায় নবজাতক ঈসা (আ.) কথা বললেন।

তিনি বললেন,

"আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে যেখানেই থাকি বরকতময় করেছেন এবং যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন আমাকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি সদাচারী করেছেন। তিনি আমাকে উদ্ধত ও দুর্ভাগা করেননি। আমার জন্মদিনে, মৃত্যুর দিনে এবং যেদিন আমাকে পুনরুত্থিত করা হবে, সেদিন আমার প্রতি শান্তি।"

— সূরা মারইয়াম, ১৯:৩০–৩৩

এরপর আল্লাহ ঘোষণা করেন,

> "এটাই মারইয়ামের পুত্র ঈসা—যার সম্পর্কে তারা বিতর্ক করে। আল্লাহর জন্য সন্তান গ্রহণ করা শোভনীয় নয়। তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।"
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৩৪–৩৫

যখন ঈসা (আ.) বড় হলেন, আল্লাহ তাঁকে ইনজিল দান করলেন এবং বহু মুজিযা প্রদান করলেন।

তিনি তাঁর জাতিকে বললেন,

> "আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করি, তারপর তাতে ফুঁ দিই, ফলে তা আল্লাহর অনুমতিতে পাখি হয়ে যায়। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করি এবং আল্লাহর অনুমতিতে মৃতকে জীবিত করি।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৯

লক্ষ্য করুন, প্রতিটি মুজিযার ক্ষেত্রেই কুরআন বলছে—"আল্লাহর অনুমতিতে।" অর্থাৎ ঈসা (আ.) নিজের ক্ষমতায় কিছুই করতেন না; সবই ছিল আল্লাহর প্রদত্ত মুজিযা।

ঈসা (আ.)-এর দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ।

তিনি বললেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সরল পথ।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৫১

তাঁর আহ্বানে একদল মানুষ ঈমান আনল। তারা পরিচিত হলো হাওয়ারিয়্যুন নামে।

তারা বলল,

> "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৫২

কিন্তু বনি ইসরাঈলের একাংশ ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতা করতে লাগল এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।

আল্লাহ বলেন,

> "তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেছিলেন। আর আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৫৪

পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে,

> "তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং বিষয়টি তাদের কাছে তেমন মনে হয়েছিল... বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।"
>
> — সূরা আন-নিসা, ৪:১৫৭–১৫৮

ঈসা (আ.)-এর জীবন আমাদের শেখায়, আল্লাহর ক্ষমতার সামনে কোনো অসম্ভব নেই। তিনি যেমন পিতা ছাড়া একজন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, তেমনি আদম (আ.)-কে পিতা-মাতা ছাড়াও সৃষ্টি করেছেন।

এ ঘটনাটি আরও শেখায়, নবীরা কখনো নিজেদের উপাসনার দিকে আহ্বান করেননি। ঈসা (আ.)-ও মানুষকে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর মুজিযাগুলোও ছিল আল্লাহর অনুমতিতে সংঘটিত নিদর্শন, তাঁর নিজস্ব ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ নয়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم: সর্বশেষ নবী, সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত এবং কুরআনের চূড়ান্ত বার্তাবাহক।

সমাপনী অংশ

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ

صلى الله عليه وسلم

সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত ও কুরআনের চূড়ান্ত বার্তাবাহক

পর্ব ৩০ – ৩০

প র্ব

৩০

মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم

সর্বশেষ নবী, সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত এবং আল্লাহর চূড়ান্ত কিতাব আল-কুরআনের শিক্ষক ও প্রচারক।

আদম (আ.) থেকে শুরু করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত যুগে যুগে আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সবার দাওয়াত ছিল একটিই—একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। কিন্তু প্রতিটি নবী নির্দিষ্ট জাতি বা অঞ্চলের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

অবশেষে আল্লাহ এমন একজন মহান রাসূল প্রেরণ করলেন, যাঁর দাওয়াত কোনো একটি জাতি, ভাষা বা ভূখণ্ডের জন্য নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য। তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم।

আল্লাহ বলেন,

> "আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"
>
> — সূরা সাবা, ৩৪:২৮

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"
>
> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০৭

মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم জন্মগ্রহণ করেন মক্কা নগরীতে, কুরাইশ বংশে। শৈশবেই তিনি পিতা-মাতাকে হারান। এরপর দাদা আবদুল মুত্তালিব এবং পরে চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-

পালনের দায়িত্ব নেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সত্যবাদী, আমানতদার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাই মানুষ তাঁকে "আল-আমীন" (বিশ্বস্ত) এবং "আস-সাদিক" (সত্যবাদী) নামে ডাকত।

চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহায় ইবাদতে রত অবস্থায় ফেরেশতা জিবরীল (আ.) তাঁর কাছে প্রথম ওহি নিয়ে আসেন।

আল্লাহর প্রথম নির্দেশ ছিল,

> "পড়ুন, আপনার সেই প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"
>
> — সূরা আল-আলাক, ৯৬:১

এভাবেই নবুওয়াতের সূচনা হলো এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ হতে শুরু করল।

তিনি মানুষকে ডাকলেন,

> "তোমরা বলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই'—তাহলেই তোমরা সফল হবে।"
>
> — সহিহ বর্ণনাসমূহের অর্থ অনুযায়ী দাওয়াতের মূল আহ্বান

কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাঁর বিরোধিতা শুরু করল। তাঁকে মিথ্যাবাদী, কবি, জাদুকর বলা হলো। তাঁর ওপর নির্যাতন করা হলো, তাঁর সাহাবিদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হলো।

তবুও তিনি ধৈর্য হারাননি। বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মদিনায় হিজরত করলেন। সেখানে তিনি এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন, যার ভিত্তি ছিল ঈমান, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব, দয়া এবং আল্লাহভীতি।

পরবর্তী বছরগুলোতে বদর, উহুদ, খন্দকসহ বহু কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলো।

অষ্টম হিজরিতে তিনি বিজয়ী হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। অথচ প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন।

তিনি বললেন,

> "আজ তোমাদের প্রতি কোনো ভর্ৎসনা নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।"
>
> — সীরাতের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহে উল্লেখিত

এ ছিল ক্ষমা, দয়া ও মহানুভবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

নবুওয়াতের শেষ বছরে বিদায় হজে তিনি মানবজাতির জন্য এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি মানুষের জান-মাল ও সম্মান রক্ষার গুরুত্ব, সুদ, জুলুম, নারীর অধিকার এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেন।

এরপর আল্লাহ ঘোষণা করেন,

> "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩

এটি ছিল ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হওয়ার ঘোষণা।

এর কিছুদিন পর মহানবী صلى الله عليه وسلم ইন্তিকাল করেন।

কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ আজও মানবজাতির জন্য হিদায়াতের আলো হয়ে রয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> "মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।"
>
> — সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪০

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> "আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ এমন একজন ব্যক্তির মতো, যিনি একটি সুন্দর ঘর নির্মাণ করলেন, শুধু একটি ইটের স্থান খালি ছিল। মানুষ তা দেখে

> বলত, 'ইটটি যদি বসানো হতো!' আমিই সেই শেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৫৩৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২৮৬

মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم-এর জীবন আমাদের শেখায়, সত্যের পথে ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া, ন্যায়বিচার, বিনয় এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই একজন মুমিনের প্রকৃত পরিচয়।

তিনি শুধু একজন নবীই নন; তিনি ছিলেন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ নেতা, আদর্শ বিচারক, আদর্শ শিক্ষক এবং সর্বোপরি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা।

আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ—তার জন্য, যে আল্লাহ ও আখিরাতের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"
>
> — সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১

এই ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা কুরআনে উল্লেখিত নবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাঁদের সবার দাওয়াত ছিল একই—তাওহীদ, তাকওয়া, ন্যায়, ধৈর্য এবং আল্লাহর আনুগত্য।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে নবীদের পথ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন এবং কিয়ামতের দিন তাঁদের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য দান করুন।

আ-মীন।

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ

প্রতিটি পর্বে যে সূত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, পর্ব অনুযায়ী সেগুলোর তালিকা।

পর্ব ১ · আদম (আ.)

- সূরা আল-বাকারা, ২:৩০
- সূরা সাদ, ৩৮:৭১–৭২
- সূরা আল-বাকারা, ২:৩১–৩২
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১২
- সূরা আল-হিজর, ১৫:৩৪–৩৫
- সূরা আল-বাকারা, ২:৩৫
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২০–২২
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৩
- সূরা আল-বাকারা, ২:৩৮

পর্ব ২ · ইদরিস (আ.)

- সূরা মারইয়াম, ১৯:৫৬–৫৭
- সূরা মারইয়াম, ১৯:৫৭
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৪

পর্ব ৩ · নূহ (আ.)

- সূরা নূহ, ৭১:২৩; সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯২০
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৯
- সূরা নূহ, ৭১:১০–১২
- সূরা নূহ, ৭১:৫–৯
- সূরা নূহ, ৭১:৭
- সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:১৪
- সূরা হূদ, ১১:৪০
- সূরা হূদ, ১১:৩৬
- সূরা হূদ, ১১:৩৭
- সূরা হূদ, ১১:৩৮

- সূরা আল-কামার, ৫৪:১১–১২
- সূরা হূদ, ১১:৪২
- সূরা হূদ, ১১:৪৩
- সূরা হূদ, ১১:৪৪

পর্ব ৪ · হূদ (আ.)-এর দাওয়াত ও 'আদ জাতির ধ্বংস

- সূরা আল-ফাজর, ৮৯:৬–৮
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৬৫
- সূরা হূদ, ১১:৫১
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৬৬
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৬৭
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৬৯
- সূরা ফুসসিলাত, ৪১:১৫
- সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:২৪
- সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:৭
- সূরা হূদ, ১১:৫৮

পর্ব ৫ · সালিহ (আ.)-এর দাওয়াত ও সামূদ জাতির অবাধ্যতার পরিণতি

- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৭৪ ; সূরা আল-ফাজর, ৮৯:৯
- সূরা হূদ, ১১:৬১
- সূরা হূদ, ১১:৬২
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৭৩
- সূরা আল-কামার, ৫৪:২৮
- সূরা আশ-শামস, ৯১:১৪
- সূরা হূদ, ১১:৬৫
- সূরা হূদ, ১১:৬৭ ; সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৭৮
- সূরা হূদ, ১১:৬৭
- সূরা হূদ, ১১:৬৬

পর্ব ৬ · ইবরাহিম (আ.) ও তাওহীদের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম

- সূরা আল-আন'আম, ৬:৭৪
- সূরা মারইয়াম, ১৯:৪২
- সূরা মারইয়াম, ১৯:৪৩

- সূরা মারইয়াম, ১৯:৪৬
- সূরা মারইয়াম, ১৯:৪৭
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৫২
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৫৩
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৫৭–৫৮
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৬৩
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৬৪–৬৫
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৬৯
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৭০
- সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:২৬

পর্ব ৭ · ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)

- সূরা আল-বাকারা, ২:১২৪
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০০
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০১
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৩৬৪
- সূরা ইবরাহিম, ১৪:৩৭
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০২
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০৩
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০৪–১০৬
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০৭
- সূরা আল-বাকারা, ২:১২৭
- সূরা আল-বাকারা, ২:১২৮
- সূরা আল-বাকারা, ২:১২৯

পর্ব ৮ · লূত (আ.)

- সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:২৬; সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮০
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮০
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮১
- সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:২৯
- সূরা আন-নামল, ২৭:৫৬
- সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৩০
- সূরা হূদ, ১১:৬৯–৭৬

- সূরা হূদ, ১১:৭৭–৭৯
- সূরা হূদ, ১১:৭৮
- সূরা হূদ, ১১:৭৯
- সূরা হূদ, ১১:৮১
- সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:১০
- সূরা হূদ, ১১:৮২
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৪

পর্ব ৯ · ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)

- সূরা হূদ, ১১:৬৯–৭০
- সূরা আল-হিজর, ১৫:৫৩
- সূরা হূদ, ১১:৭২
- সূরা হূদ, ১১:৭৩
- সূরা হূদ, ১১:৭১
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৭২–৭৩
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৭২
- সূরা আল-বাকারা, ২:১৩৩
- সূরা সাদ, ৩৮:৪৫–৪৭

পর্ব ১০ · ইউসুফ (আ.)

- সূরা ইউসুফ, ১২:৩
- সূরা ইউসুফ, ১২:৪
- সূরা ইউসুফ, ১২:৫
- সূরা ইউসুফ, ১২:৮
- সূরা ইউসুফ, ১২:১৫
- সূরা ইউসুফ, ১২:১৭–১৮
- সূরা ইউসুফ, ১২:১৮
- সূরা ইউসুফ, ১২:১৯–২১
- সূরা ইউসুফ, ১২:২২
- সূরা ইউসুফ, ১২:২৩
- সূরা ইউসুফ, ১২:৩৫
- সূরা ইউসুফ, ১২:৩৬–৪০
- সূরা ইউসুফ, ১২:৪৩–৪৯

- সূরা ইউসুফ, ১২:৫৪–৫৫
- সূরা ইউসুফ, ১২:৫৮
- সূরা ইউসুফ, ১২:৯০
- সূরা ইউসুফ, ১২:৯২
- সূরা ইউসুফ, ১২:১০০
- সূরা ইউসুফ, ১২:১০১

পর্ব ১১ · আইয়ূব (আ.)

- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৩
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৪
- সূরা সাদ, ৩৮:৪২
- সূরা সাদ, ৩৮:৪৪
- জামে আত-তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৮ ; হাদিসটি সহিহ

পর্ব ১২ · শু'আইব (আ.) ও মাদইয়ানবাসীর প্রতারণা, অন্যায় ও ন্যায়ের আহ্বান

- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৫
- সূরা হূদ, ১১:৮৪
- সূরা হূদ, ১১:৮৫
- সূরা হূদ, ১১:৮৭
- সূরা হূদ, ১১:৮৮
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৮
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯১ ; সূরা হূদ, ১১:৯৪ ; সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:১৮৯
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯১
- সূরা হূদ, ১১:৯৪
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯৩

পর্ব ১৩ · মূসা (আ.)

- সূরা আন-নাযিআত, ৭৯:২৪
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৪
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৮
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৯
- সূরা আল -কাসাস, ২৮:১০

- সূরা আল-কাসাস, ২৮:১২
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৩
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৩৯
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৪

পর্ব ১৪ · মূসা (আ.)

- সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৫
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৬
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৭
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:১৮–২০
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:২০
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:২১
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৩
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৪
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৫
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৬
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৭–২৮
- সূরা ত্বা-হা, ২০:১০; সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৯
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩০
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩১
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩২
- সূরা ত্বা-হা, ২০:২৪
- সূরা ত্বা-হা, ২০:২৫–৩২
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৩৬; সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩৪–৩৫
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৪৪

পর্ব ১৫ · মূসা (আ.) ও ফিরআউন

- সূরা ত্বা-হা, ২০:৪৭
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২৩
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২৪
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:১৮
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২০–২১
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১০৬

- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১০৭–১০৮
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১০৯
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১১৩–১১৪
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৬৬
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৬৮
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১১৮
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১২০–১২২
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৭১
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৭২–৭৩

পর্ব ১৬ · মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈলের মুক্তি

- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৩০–১৩৫
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৫২
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৫৩–৫৬
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬১
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬২
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬৩
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৭৭
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৭৮
- সূরা ইউনুস, ১০:৯০
- সূরা ইউনুস, ১০:৯১
- সূরা ইউনুস, ১০:৯২
- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৬৫–৬৭

পর্ব ১৭ · মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈল

- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৩৮
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৩৮–১৪০
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪২
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৮৮
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯০
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯১
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪৫
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫০

- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৪
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৫
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৭
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৮

পর্ব ১৮ · মূসা (আ.) ও বনি ইসরাঈল

- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২১
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২২
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৩
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৪
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৫
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৬
- সূরা আল-বাকারা, ২:৫৭
- সূরা আল-বাকারা, ২:৬০
- সূরা আল-বাকারা, ২:৬১

পর্ব ১৯ · মূসা (আ.) ও খিজির

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১২২
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১২২; সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬০
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬০
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬১
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৪
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৫
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৬
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৭–৬৮
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬৯
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭০
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭১
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭২
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৩
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৪
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৫
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৬

- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৭
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৮
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৭৯
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৮০–৮১
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৮২

পর্ব ২০ · হারূন (আ.)

- সূরা ত্বা-হা, ২০:২৯–৩২
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩৪
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৩৬
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৪৩–৪৪
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪২
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯০
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯১
- সূরা ত্বা-হা, ২০:৯৪
- সূরা মারইয়াম, ১৯:৫৩
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৪৮

পর্ব ২১ · যুলকিফল (আ.)

- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৫
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৬
- সূরা সাদ, ৩৮:৪৫–৪৮

পর্ব ২২ · দাউদ (আ.)

- সূরা আল-বাকারা, ২:২৪৬–২৪৯
- সূরা আল-বাকারা, ২:২৪৯
- সূরা আল-বাকারা, ২:২৫০
- সূরা আল-বাকারা, ২:২৫১
- সূরা সাদ, ৩৮:২৬
- সূরা সাদ, ৩৮:১৮–১৯
- সূরা সাবা, ৩৪:১০
- সূরা আন-নিসা, ৪:১৬৩; সূরা আল-ইসরা, ১৭:৫৫
- সূরা সাবা, ৩৪:১১

- সূরা সাদ, ৩৮:২৪
- সূরা সাদ, ৩৮:২৫
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১১৩১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১৫৯

পর্ব ২৩ · সুলাইমান (আ.)

- সূরা আন-নামল, ২৭:১৬
- সূরা আন-নামল, ২৭:১৭
- সূরা আন-নামল, ২৭:১৮
- সূরা আন-নামল, ২৭:১৯
- সূরা আন-নামল, ২৭:২০–২১
- সূরা আন-নামল, ২৭:২২
- সূরা আন-নামল, ২৭:২৪
- সূরা আন-নামল, ২৭:২৮
- সূরা আন-নামল, ২৭:৩০–৩১
- সূরা আন-নামল, ২৭:৩৮
- সূরা আন-নামল, ২৭:৪০
- সূরা আন-নামল, ২৭:৪৪
- সূরা সাবা, ৩৪:১২; সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮১
- সূরা সাবা, ৩৪:১৩
- সূরা সাবা, ৩৪:১৪

পর্ব ২৪ · ইলিয়াস (আ.)

- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৩
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৪–১২৬
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৭
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৮
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১২৯–১৩২

পর্ব ২৫ · আল-ইয়াসা (আ.)

- সূরা আল-আন'আম, ৬:৮৬
- সূরা সাদ, ৩৮:৪৫–৪৮

পর্ব ২৬ · ইউনুস (আ.)

- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৭

- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৪০–১৪১
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৪২
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৮
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৪৩–১৪৪
- সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৪৫–১৪৬
- সূরা ইউনুস, ১০:৯৮
- জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৫০৫; হাদিসটি সহিহ

পর্ব ২৭ · যাকারিয়া (আ.)

- সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৭
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৮
- সূরা মারইয়াম, ১৯:৪–৬
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৯
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৪০
- সূরা মারইয়াম, ১৯:৯
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৪১; সূরা মারইয়াম, ১৯:১০

পর্ব ২৮ · ইয়াহইয়া (আ.)

- সূরা মারইয়াম, ১৯:৭
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৯
- সূরা মারইয়াম, ১৯:১২
- সূরা মারইয়াম, ১৯:১৩
- সূরা মারইয়াম, ১৯:১৪
- সূরা মারইয়াম, ১৯:১৫
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৪

পর্ব ২৯ · ঈসা (আ.)

- সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৫
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৭
- সূরা মারইয়াম, ১৯:১৬–২২
- সূরা মারইয়াম, ১৯:২৪–২৬
- সূরা মারইয়াম, ১৯:২৯
- সূরা মারইয়াম, ১৯:৩০–৩৩

- সূরা মারইয়াম, ১৯:৩৪–৩৫
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৯
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৫১
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৫২
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৫৪
- সূরা আন-নিসা, ৪:১৫৭–১৫৮

পর্ব ৩০ • মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم

- সূরা সাবা, ৩৪:২৮
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০৭
- সূরা আল-আলাক, ৯৬:১
- সহিহ বর্ণনাসমূহের অর্থ অনুযায়ী দাওয়াতের মূল আহ্বান
- সীরাতের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহে উল্লেখিত
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩
- সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৫৩৫ ; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২৮৬
- সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১

কুরআনে বর্ণিত নবীদের জীবন

কুরআনের আলোকে

সংকলন ও সম্পাদনা: ইহছানুল হক ছাজিদ